আকাঙ্ক্ষা করবে, কিন্তু জান্নাতে প্রবিষ্ট হবে না, তখন পাপী মু'মিনরা যাদের পাপ আ'রাফ-বাসীদের পাপের চাইতে বেশী, কিছুতেই তখন দোযখ থেকে বের হবে না। কিন্তু তাদেরকে সম্বোধন করে উপরোক্ত কথা বলা হবে না। তাই তাদেরকে বাদ রাখার জন্য 'অনেককে' বলা হয়েছে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

জান্নাতীরা জান্নাতে এবং দোযখীরা দোযখে নিজ নিজ ঠিকানায় পৌঁছে গেলে বাহ্যতই উভয় স্থানের মধ্যে সবদিক দিয়ে বিরাট ব্যবধান হবে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও কোরআন পাকের অনেক আয়াত সাক্ষ্য দেয় যে, উভয় স্থানের মাঝখানে এমন কিছু রাস্তা থাকবে যার ফলে একে অপরকে দেখতে পারবে এবং পরস্পরের মধ্যে কথাবার্তা ও প্রশ্নোত্তর হবে।

সূরা সাফফাতে দু'ব্যক্তির কথা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তারা দুনিয়াতে একে অপরের সঙ্গী ছিল ; কিন্তু একজন ছিল মু'মিন আর অপরজন ছিল কাফির। পরকালে যখন মু'মিন জান্নাত এবং কাফির দোযখে চলে যাবে, তখন তারা একে অপরকে দেখবে এবং কথাবার্তা বলবে। বলা হয়েছে ঃ

فَاطَّلَعَ فَرَاٰهُ فِىْ سَوَاۤءِ الْجَحِيْمِ ○ قَالَ تَاللّٰهِ اِنْ كِدْتَّ لَتُرْدِيْنِ ○ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّىْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ○ اَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِيْنَ ○ اِلَّا مَوْتَتَنَا الْاُوْلٰى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ○

এ আয়াতের সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু এই ঃ জান্নাতী সাথী উঁকি দিয়ে দোযখী সাথীকে দেখবে এবং তাকে দোযখের মধ্যস্থলে পতিত পাবে। সে বলবে ঃ হতভাগা, তোর ইচ্ছা ছিল আমিও তোর মত বরবাদ হয়ে যাই। যদি আল্লাহ্‌র কৃপা না হত, তবে আজ আমিও তোর সাথে জাহান্নামে পড়ে থাকতাম। তুই আমাকে বলতিস যে, এ দুনিয়ার মৃত্যুর পর কোন জীবন, কোন হিসাব-কিতাব বা সওয়াব-আযাব হবে না। এখন দেখলি এসব কি হচ্ছে ?

আলোচ্য আয়াতসমূহ ও পরবর্তী প্রায় এক রুকূ পর্যন্ত এ ধরনেরই কথাবার্তা ও প্রশ্নোত্তর বর্ণিত হয়েছে, যা জান্নাতী ও দোযখীদের মধ্যে হবে।

জান্নাত ও দোযখের মাঝখানে একে অপরকে দেখা ও কথাবার্তা বলার পথও প্রকৃতপক্ষে দোযখীদের জন্য এক প্রকার আযাব হবে। চতুর্দিক থেকে তাদের প্রতি অভিসম্পাত বর্ষিত হবে। জান্নাতীদের নিয়ামত ও সুখ দেখে দোযখের আগুনের সাথে সাথে অনুতাপের আগুনেও তারা দগ্ধ হবে। অপরপক্ষে জান্নাতীদের নিয়ামত ও সুখে এক নতুন সংযোজন হবে। কেননা, প্রতিপক্ষের বিপদ দেখে নিজ সুখ ও নিয়ামতের মূল্য বেড়ে যাবে। যারা দুনিয়াতে ধার্মিকদের প্রতি বিদ্রূপ-বাণ বর্ষণ করত এবং তারা কোনরূপ প্রতিশোধ নিত না, আজ তাদেরকে

অপমানিত ও লাঞ্ছিত অবস্থায় আযাবে পতিত দেখে তারা হাসবে যে, তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল তারা পেয়ে গেছে। কোরআন পাকে এ বিষয়টি সূরা 'মুতাফফিফীনে' এভাবে বিধৃত হয়েছে ঃ

فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنَ عَلَى الْاَرَآئِكِ يَنْظُرُوْنَ ۝
هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ۝

দোযখীদের তাদের পথভ্রষ্টতার জন্য হুঁশিয়ারি এবং বোকাসুলভ কথাবার্তার জন্য ফেরেশতাদের পক্ষ থেকেও তিরস্কার করা হবে। তারা তাদেরকে সম্বোধন করে বলবে ঃ

هٰذِهِ النَّارُ الَّتِىْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ۝ اَفَسِحْرٌ هٰذَآ اَمْ اَنْتُمْ لَا تُبْصِرُوْنَ

এ হচ্ছে ঐ আগুন, যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে। এখন দেখ এটা কি যাদু, না তোমরা চোখে দেখ না ?

এমনিভাবে আলোচ্য প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে যে, জান্নাতীরা দোযখীদের প্রশ্ন করবে ঃ আমাদের পালনকর্তা আমাদের সাথে যেসব নিয়ামত ও সুখের ওয়াদা করেছিলেন, আমরা সেগুলো সম্পূর্ণ সঠিক পেয়েছি। তোমরা বল, তোমাদের যে শাস্তির ভয় প্রদর্শন করা হয়েছিল, তা তোমাদের সামনে এসেছে কি না ? তারা স্বীকার করবে যে, নিঃসন্দেহে আমরা তা প্রত্যক্ষ করেছি।

তাদের এ প্রশ্নোত্তরের সমর্থনে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কোন ফেরেশতা ঘোষণা করবে যে, জালিমদের উপর আল্লাহ্ তা'আলার অভিসম্পাত হোক। তারা মানুষকে আল্লাহ্‌র পথে আসতে বাধা দিত এবং পরকালে অবিশ্বাস করত।

আ'রাফবাসী কারা ? ঃ জান্নাতী ও দোযখীদের পারস্পরিক কথাবার্তা প্রসঙ্গে তৃতীয় আয়াতে আরও একটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে যে, কিছু লোক এমনও থাকবে, যারা দোযখ থেকে তো মুক্তি পাবে, কিন্তু তখনও জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করার আশা পোষণ করবে। তাদেরকেই আ'রাফবাসী বলা হয়।

আ'রাফ কি ? ঃ সূরা হাদীদের আয়াত থেকে এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এতে জানা যায় যে, হাশরের ময়দানে তিনটি দল হবে। এক. সুস্পষ্ট কাফির ও মুশরিক। এদের পুলসিরাত চলার প্রশ্নই উঠবে না। এর আগে জাহান্নামের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে। দুই. মু'মিনের দল। তাদের সাথে ঈমানের আলো থাকবে। তিন. মুনাফিকের দল। এরা দুনিয়াতে মুসলমানদের সাথে সংযুক্ত থাকত। সেখানেও প্রথম দিকে তাদের সাথে সংযুক্ত থাকবে এবং পুলসিরাতে চলতে শুরু করবে। তখন একটি ভীষণ অন্ধকার সবাইকে ঘিরে ফেলবে। মু'মিনরা ঈমানের আলোর সাহায্যে সামনে অগ্রসর হবে। মুনাফিকরা ডেকে ডেকে তাদেরকে বলবে ঃ একটু আস। আমরাও তোমাদের আলো দ্বারা উপকৃত হই। এতে আল্লাহ্‌র পক্ষ

থেকে কোন ফেরেশতা বলবেঃ পেছনে ফিরে যাও এবং সেখানেই আলোর তালাশ কর। উদ্দেশ্য এই যে, এ আলো হচ্ছে ঈমান ও সৎ কর্মের। এ আলো হাসিল করার স্থান পেছনে চলে গেছে। যারা সেখানে ঈমান ও সৎকর্মের মাধ্যমে এ আলো অর্জন করেনি, তারা আজ আলো দ্বারা উপকৃত হবে না। এমতাবস্থায় মু'মিন ও মুনাফিকদের মধ্যে একটি প্রাচীর-বেষ্টনী দাঁড় করিয়ে দেওয়া হবে। এতে একটি দরজা থাকবে। দরজার বাইরে কেবলই আযাব দৃষ্টিগোচর হবে এবং ভেতরে মু'মিনরা থাকবে। তাদের সামনে আল্লাহ্‌র রহমত এবং জান্নাতের মনোরম পরিবেশ বিরাজ করবে। নিম্নোক্ত আয়াতের বিষয়বস্তু তাই ঃ

يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ ۚ قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا ۭ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَّهٗ بَابٌ ۭ بَاطِنُهٗ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهٗ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ۝

এ আয়াতে জান্নাতী ও দোযখীদের মধ্যবর্তী প্রাচীর বেষ্টনীকে سور শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। এ শব্দটি আসলে শহর-প্রাচীরের অর্থে বলা হয়। শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বড় বড় শহরের চারদিকে খুব মজবুত ও অজেয় করে এ প্রাচীর তৈরী করা হয়। এসব প্রাচীরে রক্ষী সেনাদলের গোপন অবস্থানও তৈরী করা হয়। তারা আক্রমণ-কারীদের গতিবিধি নিরীক্ষণ করে।

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ۭ وَعَلَى الْاَعْرَافِ رِجَالٌ يَّعْرِفُوْنَ كُلًّۢا بِسِيْمٰهُمْ

ইবনে জারীর ও অন্যান্য তফসীরবিদের মতে এ আয়াতে حجاب বলে ঐ প্রাচীর বেষ্টনীকেই বোঝানো হয়েছে, যা সূরা হাদীদে سور শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। এ প্রাচীর বেষ্টনীর উপরিভাগের নাম আ'রাফ। কেননা আ'রাফ 'ওরফে'র বহুবচন। এর অর্থ প্রত্যেক বস্তুর উপরিভাগ। কারণ দূর থেকে এ ভাগই 'মারূফ' তথা খ্যাত হয়ে থাকে। এ ব্যাখ্যা থেকে জানা গেল যে, জান্নাত ও দোযখের মধ্যবর্তী প্রাচীর বেষ্টনীর উপরিভাগকে আ'রাফ বলা হয়। আয়াতে বলা হয়েছে যে, হাশরে এ স্থানে কিছু সংখ্যক লোক থাকবে। তারা জান্নাত ও দোযখ উভয় দিকের অবস্থা নিরীক্ষণ করবে এবং উভয় পক্ষের লোকদের সাথে প্রশ্নোত্তর ও কথাবার্তা বলবে।

এখানে জিজ্ঞাস্য এই যে, এরা কারা এবং এ মধ্যবর্তী স্থানে এদেরকে কেন আটক করা হবে? এ সম্পর্কে তফসীরবিদদের বিভিন্ন উক্তি এবং একাধিক হাদীস বর্ণিত আছে। তবে অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে বিশুদ্ধ ও অগ্রগণ্য উক্তি এই যে-- এরা ঐ সব লোক, যাদের পাপ ও পুণ্য ওজনে সমান সমান হবে। তারা পুণ্যের কারণে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে, কিন্তু পাপের কারণে তখনও জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাবে না। তবে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহে তারাও জান্নাতে প্রবেশ করবে।

হযরত হুযায়ফা, ইবনে মসউদ, ইবনে আব্বাস (রা) ও অন্যান্য সাহাবী ও তাবেয়ীর অভিমত তা-ই। এ অর্থে বর্ণিত সব হাদীসের মধ্যেও বিরোধ থাকে না। ইবনে জারীর হুযায়ফার বাচনিক বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে আ'রাফবাসীদের সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন ঃ তাদের পাপ ও পুণ্য ওজনে সমান সমান হবে। তাই জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়েও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। তাদেরকে আ'রাফ নামক স্থানে থামিয়ে রাখা হবে এবং সব জান্নাতী ও দোযখীর হিসাব-নিকাশ ও ফয়সালা হয়ে যাওয়ার পর তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে এবং অবশেষে তাদেরকে ক্ষমা করে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে।---(ইবনে কাসীর)

ইবনে মরদুবিয়াহ্ জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ বাচনিক বর্ণনা দিয়ে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আ'রাফবাসীদের সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন ঃ তারা ঐ সব লোক, যারা পিতামাতার ইচ্ছা ও অনুমতির বিপক্ষে জিহাদে যোগদান করে শহীদ হয়েছে। পিতামাতার অবাধ্যতা তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করতে বাধা দেয় এবং আল্লাহ্র পথে শাহাদত বরণ জাহান্নামে প্রবেশে বাধা দেয় ।

উপরোক্ত উভয় হাদীসের মধ্যে বিরোধ নেই। বরং শেষোক্ত হাদীসটি পাপ ও পুণ্য যাদের সমান সমান হবে, তাদের একটি দৃষ্টান্ত। এক দিকে আল্লাহ্র পথে শাহাদত বরণ এবং অপর দিকে পিতামাতার অবাধ্যতা ; দাঁড়িপাল্লায় উভয়টি সমান হয়ে যাবে।--(ইবনে কাসীর)

সালামের মসনূন শব্দ ঃ আ'রাফবাসীদের ব্যাখ্যা ও সংজ্ঞা জ্ঞাত হওয়ার পর এখন আয়াতের বিষয়বস্তু দেখুন। বলা হয়েছে ঃ আ'রাফবাসীরা জান্নাতীদের ডেকে বলবে ঃ সালামুন আলায়কুম। এ বাক্যটি দুনিয়াতেও পারস্পরিক সাক্ষাতের সময় সম্মান প্রদর্শনার্থ বলা হয় এবং বলা সুন্নত। মৃত্যুর পর কবর যিয়ারতের সময় এবং হাশর ও কিয়ামতেও বলা হবে। কিন্তু আয়াত ও হাদীস দৃষ্টে জানা যায় যে, দুনিয়াতে 'আসসালামু আলায়কুম' বলা সুন্নত। কবর যিয়ারতের জন্য কোরআন পাকে سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ উল্লিখিত হয়েছে। ফেরেশতারা যখন জান্নাতীদের অভ্যর্থনা করবে, তখনও বাক্যটি এভাবেই বলা হবে ঃ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ আলোচ্য আয়াতেও আ'রাফবাসীরা জান্নাতীদের এ বাক্য দ্বারা সালাম করবে।

অতঃপর আ'রাফবাসীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা এখনও জান্নাতে প্রবেশ করেনি, কিন্তু এ ব্যাপারে আগ্রহী। অতঃপর বলা হয়েছে ঃ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ

تِلْقَاءَ اَصْحٰبِ النَّارِ قَالُوْا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ

অর্থাৎ আ'রাফবাসীদের দৃষ্টি যখন দোযখীদের উপর পতিত হবে এবং তারাও তাদের শাস্তি ও বিপদ প্রত্যক্ষ করবে, তখন আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবে যে, আমাদেরকে এসব জালিমের সাথী করবেন না।

পঞ্চম আয়াতেও বলা হয়েছে যে, আ'রাফবাসীরা দোযখীদের সম্বোধন করে তিরস্কার করবে এবং বলবে ঃ দুনিয়াতে তোমরা স্বীয় ধনসম্পদ, দলবল ও লোকজনের উপর ভরসা করে খুব গর্বিত ছিলে। আজ সেগুলো কোন উপকারে আসেনি।

ষষ্ঠ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

اَهٰٓؤُلَاۤءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللّٰهُ بِرَحْمَةٍ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَآ اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ ۝

এ আয়াতের তফসীরে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ যখন জান্নাতী ও দোযখী এবং উভয় দলের সাথে আ'রাফবাসীদের প্রশ্নোত্তর সমাপ্ত হবে, তখন রাব্বুল-আলামীন দোযখীদের সম্বোধন করে আ'রাফবাসীদের সম্পর্কে বলবেন ঃ তোমরা কসম খেয়ে বলতে যে, এদের মাগফিরাত হবে না এবং আল্লাহ্ এদের প্রতি করুণা করবেন না; এখন আমার করুণা দেখে নাও। সাথে সাথে আ'রাফবাসীদের সম্বোধন করে বলবেন ঃ যাও তোমরা জান্নাতে চলে যাও ; বিগত বিষয়াদির জন্য তোমাদের কোন শংকা নেই এবং ভবিষ্যতেরও কোন চিন্তাভাবনা নেই।—(ইবনে কাসীর)

وَنَادٰٓى اَصْحٰبُ النَّارِ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اَنْ اَفِيْضُوْا عَلَيْنَا مِنَ الْمَآءِ اَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ۭ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَهْوًا وَّلَعِبًا وَّغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ نَنْسٰىهُمْ كَمَا نَسُوْا لِقَآءَ يَوْمِهِمْ هٰذَا ۙ وَمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ۝ وَلَقَدْ جِئْنٰهُمْ بِكِتٰبٍ فَصَّلْنٰهُ عَلٰى عِلْمٍ هُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝ هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا تَاْوِيْلَهٗ ۭ يَوْمَ يَاْتِيْ تَاْوِيْلُهٗ

يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۚ
فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي
كُنَّا نَعْمَلُ ۚ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٥٣﴾

(৫০) দোযখীরা জান্নাতীদের ডেকে বলবেঃ আমাদের উপর সামান্য পানি নিক্ষেপ কর অথবা আল্লাহ্ তোমাদের যে রুযী দিয়েছেন, তা থেকেই কিছু দাও। তারা বলবেঃ আল্লাহ্ এই উভয় বস্তু কাফিরদের জন্য নিষিদ্ধ করেছেন, (৫১) তারা স্বীয় ধর্মকে তামাশা ও খেলা বানিয়ে নিয়েছিল এবং পার্থিব জীবন তাদের ধোঁকায় ফেলে রেখেছিল। অতএব আমি আজকে তাদের ভুলে যাব, যেমন তারা এ দিনের সাক্ষাতকে ভুলে গিয়েছিল এবং যেমন তারা আয়াতসমূহকে অবিশ্বাস করত। (৫২) আমি তাদের কাছে গ্রন্থ পৌঁছিয়েছি, যা আমি স্বীয় জ্ঞান দ্বারা বিস্তারিত বর্ণনা করেছি, যা পথপ্রদর্শক এবং মু'মিনদের জন্য রহমত। (৫৩) তারা কি এখন এ অপেক্ষায়ই আছে যে, এর বিষয়বস্তু প্রকাশিত হোক? যেদিন এর বিষয়বস্তু প্রকাশিত হবে, সেদিন পূর্বে যারা একে ভুলে গিয়েছিল, তারা বলবেঃ বাস্তবিকই আমাদের পালনকর্তার পয়গম্বরগণ সত্যসহ আগমন করেছিলেন। অতএব, আমাদের জন্য কোন সুপারিশকারী আছে কি, যে সুপারিশ করবে অথবা আমাদের পুনঃ প্রেরণ করা হলে আমরা পূর্বে যা করতাম, তার বিপরীত কাজ করে আসতাম। নিশ্চয় তারা নিজেদের ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। তারা মনগড়া যা বলত, তা উধাও হয়ে যাবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (পূর্বে জান্নাতীরা যেমন দোযখীদের সাথে কথা বলেছে, তেমনি) দোযখীরা জান্নাতীদের ডেকে বলবেঃ (আমরা ক্ষুধা, পিপাসা ও উত্তাপের যন্ত্রণায় ছটফট করছি, আল্লাহ্র ওয়াস্তে) আমাদের উপর সামান্য পানিই নিক্ষেপ কর (সম্ভবত কিছু শান্তি হবে) কিংবা অন্য কিছুই দাও, যা আল্লাহ্ তোমাদেরকে দান করেছেন। (এতে জরুরী নয় যে, তারা আশা করে তা চাইবে। কেননা, অধিক অস্থিরতার সময় আশাতীত কথাবার্তাও মুখ থেকে বের হয়ে পড়ে)। জান্নাতীরা (উত্তরে) বলবেঃ আল্লাহ্ তা'আলা এতদুভয় বস্তু (অর্থাৎ জান্নাতের আহার্য ও পানীয়) কাফিরদের জন্য হারাম করে রেখেছেন, যারা দুনিয়াতে স্বীয় ধর্মকে (যা কবুল করা তাদের জন্য ফরয ছিল) ক্রীড়া ও কৌতুক বানিয়ে রেখেছিল এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে ধোঁকায় (ও অমনোযোগিতায়) ফেলে রেখেছিল (তাই তারা ধর্মের পরোয়াই করেনি। এটা প্রতিদান জগত। যখন ধর্মই নেই, তখন তার ফল কোথা থেকে আসবে? অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতীদের এ উত্তর সমর্থন করে বলবেনঃ) অতএব (যখন দুনিয়াতে তাদের এ অবস্থা ছিল, তখন) আমিও আজকের (কিয়ামতের) দিন তাদেরকে ভুলে যাব। (এবং আহার্য ও পানীয় কিছুই দেব না) যেমন তারা এ দিনের সাক্ষাৎ ভুলে

গিয়েছিল এবং যেরূপে তারা আমার নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করত এবং আমি তাদের কাছে একটি গ্রন্থ (অর্থাৎ কোরআন) পৌঁছিয়েছি, যাকে আমি স্বীয় অসীম জ্ঞান দ্বারা বিস্তারিত বর্ণনা করেছি ; (সবাইকে শোনানোর জন্য এটি বর্ণনা করেছি, কিন্তু এটি) হিদায়ত ও রহমতের মাধ্যম তাদেরই জন্য (হয়েছে), যারা (একে শুনে) বিশ্বাস স্থাপন করে। (এবং যারা পূর্ণ প্রমাণ সত্ত্বেও বিশ্বাস স্থাপন করে না, তাদের অবস্থা থেকে বোঝা যায় যে,) তারা আর কোন কিছুর অপেক্ষা করে না,--শুধু এর (কোরআনের) বর্ণিত শেষ পরিণতির (অর্থাৎ প্রতিশ্রুত শাস্তির) অপেক্ষা করে। (অর্থাৎ শাস্তির পূর্বে শাস্তির ওয়াদাকে যখন ভয় করে না, তখন শাস্তিই তাদের কাম্য হয়ে থাকবে)। অতএব, যে দিন এর (বর্ণিত) শেষ পরিণাম ফল আসবে (অর্থাৎ পূর্বোল্লিখিত দোযখ ইত্যাদি) সেদিন পূর্বে যারা একে বিস্মৃত হয়েছিল, তারা (অস্থির হয়ে) বলবে ঃ বাস্তবিকই আমাদের পালনকর্তার পয়গম্বররা (দুনিয়াতে) সত্যসহ আগমন করেছিলেন (কিন্তু আমরা বোকামি করেছি)। অতএব, আমাদের জন্য কোন সুপারিশকারী আছে কি, যে আমাদের জন্য সুপারিশ করবে ? অথবা আমরা কি আবার (দুনিয়াতে) পুনঃ প্রেরিত হতে পারি, যাতে আমরা (আবার দুনিয়াতে গিয়ে) পূর্বে যে (কু-) কর্ম করতাম, তার বিপরীতে (সৎ) কর্ম করি ? (আল্লাহ্ বলেন ঃ এখন মুক্তির কোন পথ নেই।) নিশ্চয়ই তারা নিজেদেরকে (কুফরের) ক্ষতির মধ্যে নিক্ষেপ করেছে এবং তারা যা যা মনগড়া বলত, (এখন) সব উধাও হয়ে গেছে (এখন শাস্তি ছাড়া আর কিছুই বাকী থাকবে না)।

إِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ
ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا
وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرٰتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ
تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِينَ ﴿٥٤﴾

(৫৪) নিশ্চয় তোমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্। তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি পরিয়ে দেন রাতের উপর দিনকে এমতাবস্থায় যে, দিন দৌড়ে দৌড়ে রাতের পেছনে আসে। তিনি সৃষ্টি করেছেন সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র স্বীয় আদেশের অনুগামী। শুনে রেখ, তারই কাজ সৃষ্টি করা এবং আদেশ দান করা। আল্লাহ্ বরকতময়, যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলাই তোমাদের পালনকর্তা, যিনি সমস্ত নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলকে ছয় দিনে (অর্থাৎ ছয় দিনের সমান সময়ে) সৃষ্টি করেছেন---অতঃপর আরশের উপর (যা

সিংহাসনের অনুরূপ, এভাবে) অধিষ্ঠিত (ও দেদীপ্যমান) হয়েছেন (যেমনটি তাঁর মর্যাদার উপযুক্ত)। তিনি সমাচ্ছন্ন করেন রাত্রি দ্বারা (অর্থাৎ রাত্রির অন্ধকার দ্বারা) দিনকে (অর্থাৎ দিনের আলোকে। কারণ রাত্রির অন্ধকার এলেই দিনের আলো বিদূরিত হয়ে যায়)। এভাবে যে, রাত্রি দিনকে দ্রুত ধরে ফেলে (অর্থাৎ দিন দেখতে দেখতে অতিক্রান্ত হয়ে যায় এবং হঠাৎ রাত্রি এসে যায়)। এবং চন্দ্র, সূর্য ও অন্যান্য তারকা সৃষ্টি করেছেন, এভাবে যে, সবাই তাঁর (সৃষ্টিগত) আদেশের অনুগামী। স্মরণ রেখ, স্রষ্টা হওয়া এবং আদেশদাতা হওয়া আল্লাহ্‌রই জন্য নির্দিষ্ট। বড় মঙ্গলময় আল্লাহ্ তা'আলা, যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য প্রথম আয়াতে নভোমণ্ডল ও গ্রহ-নক্ষত্র সৃষ্টি করা এবং একটি বিশেষ অটল ব্যবস্থার অনুগামী হয়ে তাদের নিজ নিজ কাজে নিয়োজিত থাকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলার অসীম শক্তির কথা বর্ণনা করে প্রত্যেক বুদ্ধিমান মানুষকে চিন্তার আহ্‌বান জানানো হয়েছে যে, যে পবিত্র সত্তা এ বিশাল বিশ্বকে সৃষ্টি করতে এবং বিজ্ঞজনোচিত ব্যবস্থাধীনে পরিচালনা করতে সক্ষম, তাঁর জন্য এসব বস্তুকে ধ্বংস করে কিয়ামতের দিন পুনরায় সৃষ্টি করা কি কঠিন কাজ? তাই কিয়ামতকে অস্বীকার না করে একমাত্র তাঁকেই স্বীয় পালনকর্তা মনে কর, তাঁর কাছেই প্রয়োজনাদি প্রার্থনা কর, তাঁরই ইবাদত কর এবং সৃষ্ট বস্তুকে পূজা করার পঙ্কিলতা থেকে বের হয়ে সত্যকে চেন। এ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্ তা'আলাই তোমাদের পালনকর্তা। তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন।

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে ছয় দিনে সৃষ্টি করার কারণ ঃ এখানে প্রশ্ন হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র বিশ্বকে মুহূর্তের মধ্যে সৃষ্টি করতে সক্ষম। স্বয়ং কোরআন পাকেও বিভিন্ন ভঙ্গিতে একথা বারবার বলা হয়েছে। কোথাও বলা হয়েছে ঃ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ অর্থাৎ এক নিমেষের মধ্যে আমার আদেশ কার্যকরী হয়ে যায়।

কোথাও বলা হয়েছে ঃ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন বস্তু সৃষ্টি করতে চান, তখন বলে দেন 'হয়ে যা'। আর সঙ্গে সঙ্গে তা সৃষ্টি হয়ে যায়। এমতাবস্থায় বিশ্ব সৃষ্টিতে ছয় দিন লাগার কারণ কি?

তফসীরবিদ হযরত সায়ীদ ইবনে জুবায়ের (রা) এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার মহাশক্তি নিঃসন্দেহে এক নিমেষে সবকিছু সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু মানুষকে বিশ্বব্যবস্থা পরিচালনায় ধারাবাহিকতা ও কর্মপক্কতা শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এতে ছয় দিন ব্যয় করা হয়েছে। যেমন রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, চিন্তা-ভাবনা, ধীরস্থিরতা ও ধারাবাহিকতা

সহকারে কাজ করা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে হয়; আর তড়িঘড়ি কাজ করা হয় শয়তানের পক্ষ থেকে।—(মাযহারী)

উদ্দেশ্য এই যে, তড়িঘড়ি কাজ করলে মানুষ কাজের সব দিক সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করতে পারে না। ফলে প্রায়ই সে কাজ নষ্ট হয়ে যায় এবং অনুতাপ করতে হয়। পক্ষান্তরে যে কাজ চিন্তাভাবনা ও ধীরে-সুস্থে করা হয়, তাতে বরকত হয়ে থাকে।

নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও গ্রহ-উপগ্রহ সৃষ্টির পূর্বে দিবারাত্রির পরিচয় কি ছিল? দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, সূর্যের পরিক্রমণের ফলে দিন ও রাত্রির সৃষ্টি। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টির পূর্বে যখন চন্দ্র-সূর্যই ছিল না, তখন ছয় দিনের সংখ্যা কি হিসাবে নিরূপিত হল?

কোন কোন তফসীরবিদ বলেছেন ঃ ছয়দিন বলে এতটুকু সময় বোঝানো হয়েছে, যা এ জগতের হিসাবে ছয়দিন হয়। কিন্তু পরিষ্কার ও নির্মল উত্তর এই যে, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যে দিন এবং সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত যে রাত এটা এ জগতের পরিভাষা। বিশ্ব সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দিবা-রাত্রির পরিচয়ের অন্য কোন লক্ষণ নির্দিষ্ট থাকতে পারে, যেমন জান্নাতের দিবারাত্রি সূর্যের পরিক্রমণের অনুগামী হবে না।

এতে আরও জানা যাচ্ছে যে, যে ছয়দিনে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করা হয়েছে, তা আমাদের ছয়দিনের সমান হওয়া জরুরী নয়; বরং এর চাইতে বড়ও হতে পারে। যেমন, পরকালের দিন সম্পর্কে কোরআনে বলা হয়েছে যে, একদিন এক হাজার বছরের সমান হবে।

আবূ আবদুল্লাহ্ রাযী (র) বলেন ঃ সপ্তম আকাশের গতি পৃথিবীর গতির তুলনায় এত বেশী দ্রুত যে, দ্রুত ধাবমান একটি লোকের একটি পা তুলে তা পুনরায় মাটিতে রাখার পূর্বেই সপ্তম আকাশ তিন হাজার মাইল দূরত্ব অতিক্রম করে ফেলে। —(বাহ্‌রে মুহীত)

সে জন্যই ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ও মুজাহিদ (র) বলেন যে, এই ছয় দিনের অর্থ পরকালের ছয় দিন। আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা)-এর এক রেওয়ায়েতেও তাই বর্ণিত রয়েছে।

সহীহ্ রেওয়ায়েত অনুযায়ী যে ছয়দিনে জগৎ সৃষ্টি হয়েছে তা রবিবার থেকে শুরু করে শুক্রবারে শেষ হয়। শনিবারে জগৎ সৃষ্টির কাজ হয়নি। কোন কোন আলিম বলেন سبت-এর অর্থ কর্তন করা। এ দিনে কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল বলে এ দিনকে يوم السبت (শনিবার) বলা হয়।—(ইবনে কাসীর)

আলোচ্য আয়াতে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টি ছয়দিনে সমাপ্ত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। সূরা হা-মীম-সিজদার নবম ও দশম আয়াতে এর বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে যে, দু'দিনে ভূমণ্ডল, দু'দিনে ভূমণ্ডলের পাহাড়, সমুদ্র, খনি, বৃক্ষ, উদ্ভিদ এবং মানুষ ও জন্তু-জানোয়ারের পানাহারের বস্তু-সামগ্রী সৃষ্টি করা হয়েছে। মোট চার দিন হল। বলা হয়েছে ঃ خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ

আবার বলা হয়েছে ঃ قَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ

যে দু'দিনে ভূমণ্ডল সৃষ্টি করা হয়েছে, তা ছিল রবিবার ও সোমবার। দ্বিতীয় দু'দিন ছিল মঙ্গল ও বুধ, যাতে ভূমণ্ডলের সাজসরঞ্জাম পাহাড়, নদী ইত্যাদি সৃষ্টি করা হয়। এরপর বলা হয়েছে ঃ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ—অর্থাৎ অতঃপর সাত আকাশ সৃষ্টি করেন দু'দিনে। বাহ্যত এ দু'দিন হবে বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার। এভাবে শুক্রবার পর্যন্ত ছয়দিন হল।

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃজনের কথা বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে ঃ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ অর্থাৎ অতঃপর আরশের উপর অধিষ্ঠিত হলেন। اسْتَوَىٰ-এর শাব্দিক অর্থ অধিষ্ঠিত হওয়া। আরশ রাজসিংহাসনকে বলা হয়। এখন আল্লাহ্‌র আরশ কিরূপ এবং কি—এর উপর অধিষ্ঠিত হওয়ার অর্থই বা কি ? এ সম্পর্কে নির্মল, পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ মাযহাব সাহাবী ও তাবেয়ীদের কাছ থেকে এবং পরবর্তীকালে সূফী বুযুর্গদের কাছ থেকে এরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, মানব জ্ঞান আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলীর স্বরূপ পূর্ণরূপে বুঝতে অক্ষম। এর অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হওয়া অর্থহীন; বরং ক্ষতিকরও বটে। এ সম্পর্কে সংক্ষেপে এরূপ বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত যে, এসব বাক্যের যে অর্থ আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দিষ্ট, তাই শুদ্ধ ও সত্য। এরপর নিজে কোন অর্থ উদ্ভাবন করার চিন্তা করাও অনুচিত।

হযরত ইমাম মালিক (র)-কে কেউ اسْتِوَاء عَلَى الْعَرْشِ-এর অর্থ জিজ্ঞেস করলে তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, اسْتِوَاء শব্দের অর্থ তো জানাই আছে, কিন্তু এর স্বরূপ ও অবস্থা মানববুদ্ধি সম্যক বুঝতে অক্ষম।—এতে বিশ্বাস স্থাপন করা ওয়াজিব। এর অবস্থা ও স্বরূপ জিজ্ঞেস করা বিদ'আত। কেননা, সাহাবায়ে কিরাম (রা) রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এ ধরনের প্রশ্ন করেন নি। সুফিয়ান সওরী, ইমাম আওযায়ী, লায়স ইবনে সা'দ, সুফিয়ান ইবনে ওয়াইনা, আবদুল্লাহ্ ইবনে মোবারক (র) প্রমুখ বলেছেন ঃ যে সব আয়াত আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে, সেগুলোর প্রতি যেভাবে আছে সেভাবেই রেখে; কোনরূপ ব্যাখ্যা ও সদর্থ ছাড়াই বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত।—(মাযহারী)

এরপর আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা রাত্রি দ্বারা দিনকে সমাচ্ছন্ন করেন এভাবে যে, রাত্রি দ্রুত দিনকে ধরে ফেলে। উদ্দেশ্য এই যে, সমগ্র বিশ্বকে আলো থেকে অন্ধকারে অথবা অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসেন। দিবারাত্রির এ বিরাট পরিবর্তন আল্লাহ্‌র কুদরতে অতি দ্রুত ও সহজে সম্পন্ন হয়ে যায়—মোটেই দেরী হয় না।

এরপর বলা হয়েছে ঃ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহকে এমতাবস্থায় সৃষ্টি করেছেন যে, সবাই আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশের অনুগামী।

এতে প্রত্যেক বুদ্ধিমানের জন্য চিন্তার খোরাক রয়েছে। বড় বড় বিশেষজ্ঞের তৈরী মেশিনসমূহে প্রথমত কিছু না কিছু দোষত্রুটি থাকে। যদি দোষত্রুটি নাও থাকে, তবুও যত কঠিন ইস্পাতের মেশিন ও কল-কব্জাই হোক না কেন, চলতে চলতে তা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং এক সময় ঢিলে হয়ে পড়ে। ফলে মেরামত দরকার হয়। এ জন্য কয়েকদিন শুধু নয়, অনেক সময় কয়েক সপ্তাহ ও কয়েক মাস তা অকেজো পড়ে থাকে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার নির্মিত মেশিনের প্রতি লক্ষ্য করুন, প্রথম দিন যেভাবে এগুলো চালু করা হয়েছিল আজো তেমনি চালু রয়েছে। এগুলোর গতিতে কখনও এক মিনিট কিংবা এক সেকেণ্ডের পার্থক্য হয় না। কখনও এগুলোর কোন কলকব্জা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না এবং কখনও কোথাও মেরামতের জন্য পাঠাতে হয় না। কারণ, এগুলো শুধুমাত্র আল্লাহ্র আদেশে চলছে। অর্থাৎ এগুলো চালানোর জন্য না বিদ্যুৎ-শক্তির প্রয়োজন হয়, না কোন ইঞ্জিনের সাহায্য নিতে হয়, বরং শুধু আল্লাহ্র আদেশের শক্তি বলেই চলছে। চলার গতিতে বিন্দুমাত্র পার্থক্য আসাও সম্ভব নয়। তবে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ নিজেই যখন নির্দিষ্ট সময়ে এগুলোকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করবেন, তখন গোটা ব্যবস্থাই তছনছ হয়ে যাবে। আর এরই নাম হল কিয়ামত।

কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে আল্লাহ্ তা'আলার অসীম ক্ষমতা একটি সামগ্রিক বিধির আকারে বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ — خلق শব্দের অর্থ সৃষ্টি করা এবং امر শব্দের অর্থ আদেশ করা। বাক্যের অর্থ এই যে, সৃষ্টিকর্তা হওয়া এবং আদেশদাতা হওয়া আল্লাহ্র জন্যই নির্দিষ্ট। অন্য কেউ না সামান্যতম বস্তু সৃষ্টি করতে পারে, আর না কাউকে আদেশ করার অধিকার রাখে। তবে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কাউকে কোন বিশেষ বিভাগ বা কার্যভার সমর্পণ করা হলে তাও বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলারই আদেশ। তাই আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, এসব বস্তু সৃষ্টি করাও তাঁরই কাজ এবং সৃষ্টির পর এগুলোকে কর্মে নিয়োগ করাও অন্য কারও সাধ্যের বিষয় নয় বরং আল্লাহ্ তা'আলারই অসীম শক্তির বহিঃপ্রকাশ।

সূফী বুযুর্গরা বলেন ঃ امر ও خلق দুটি জগৎ। خلق-এর সম্পর্ক বস্তুজগতের সাথে এবং امر এর সম্পর্ক সূক্ষ্ম ও অজড় বিষয়াদির সাথে। قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي আয়াতে 'আত্মা'কে পালনকর্তার 'আদেশ' বলে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। امر ও خلق দুই-ই আল্লাহ্র জন্য নির্দিষ্ট হওয়ার অর্থ তখন এই হবে যে, নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু রয়েছে সবই বস্তুজগৎ। এগুলোর সৃষ্টিকেই خلق বলা হয়েছে এবং নভোমণ্ডলের উর্ধ্বে যা কিছু আছে, সব অবস্তু জগৎ। এগুলোর সৃষ্টিকে امر শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ এখানে تبارك শব্দটি برکة (বরকত) থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া, বেশী হওয়া, কায়েম থাকা ইত্যাদি। তবে এখানে تبارك শব্দের অর্থ উচ্চ ও মহান হওয়া। এটা বৃদ্ধি প্রাপ্তি এবং কায়েম থাকা উভয় অর্থেই হতে পারে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা যেমন কায়েম ও প্রতিষ্ঠিত, তেমনি মহান ও উচ্চও বটেন। হাদীসের এক বাক্যেও উচ্চ হওয়া অর্থের দিকেই করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

تبارکت وتعالیت یا ذ الجلال والاکرام এখানে تبارکت শব্দের তফসীর تعالیت শব্দ দ্বারা করা হয়েছে।

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ۝
وَلَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا ۚ اِنَّ
رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

(৫৫) তোমরা স্বীয় পালনকর্তাকে ডাক কাকুতি-মিনতি করে এবং সংগোপনে। তিনি সীমা অতিক্রমকারীদের পছন্দ করেন না। (৫৬) পৃথিবীকে কুসংস্কারমুক্ত ও ঠিক করার পর তাতে অনর্থ সৃষ্টি করো না। তাকে আহবান কর ভয় ও আশা সহকারে। নিশ্চয় আল্লাহ্র করুণা সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তোমরা (সর্বাবস্থায় ও যাবতীয় প্রয়োজনে) স্বীয় পালনকর্তার কাছে দোয়া কর বিনীত-ভাবে এবং সংগোপনে। (তবে একথা) নিশ্চিত যে, আল্লাহ্ তা'আলা (দোয়ার ক্ষেত্রে শিষ্টাচারের) সীমা অতিক্রমকারীদের পছন্দ করেন না। (উদাহরণত অসম্ভব ও হারাম বিষয়ের দোয়া করা।) এবং (একত্ববাদের শিক্ষা ও পয়গম্বর প্রেরণের মাধ্যমে) পৃথিবীকে কুসংস্কার-মুক্ত ও ঠিক করার পর তাতে অনর্থ উৎপাদন করো না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলার অসীম শক্তির বহিঃপ্রকাশ এবং গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামতসমূহ বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, একমাত্র বিশ্ব পালন-কর্তাই যখন অসীম শক্তির অধিকারী এবং যাবতীয় অনুকম্পা ও নিয়ামত প্রদানকারী, তখন বিপদাপদ ও অভাব-অনটনে তাঁকেই ডাকা এবং তাঁর কাছেই দোয়া প্রার্থনা করা উচিত। তাঁকে ছেড়ে অন্যদিকে মনোনিবেশ করা মূর্খতা এবং বঞ্চিত হওয়ার নামান্তর।

এতদসহ আলোচ্য আয়াতসমূহে দোয়ার কতিপয় আদবও ব্যক্ত করা হয়েছে। এগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখলে দোয়া কবুল হওয়ার আশা বেড়ে যায়।

আরবী ভাষায় د ع ا ء (দোয়া) শব্দটির অর্থ দ্বিবিধ। এক. বিপদাপদ দূরীকরণ ও অভাব পূরণের জন্য কাউকে ডাকা এবং দুই. যে কোন অবস্থায় কাউকে স্মরণ করা। এ আয়াতে উভয় অর্থই হতে পারে। বলা হয়েছেঃ اُدْعُوْا رَبَّكُمْ অর্থাৎ অভাব পূরণের জন্য স্বীয় পালনকর্তাকে ডাক অথবা স্মরণ কর এবং পালনকর্তার ইবাদত কর।

প্রথমাবস্থায় অর্থ হবে, স্বীয় অভাব-অনটন একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছেই ব্যক্ত কর। আর দ্বিতীয়াবস্থায় অর্থ হবে, স্মরণ ও ইবাদত একমাত্র তাঁরই কর। উভয় তফসীরই পূর্ববর্তী মনীষী ও তফসীরবিদদের কাছ থেকে বর্ণিত রয়েছে।

এরপর বলা হয়েছেঃ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً تضرع—تَضَرُّعًا শব্দের অর্থ অক্ষমতা, বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করা এবং خُفْيَةً শব্দের অর্থ গোপন।

এ দু'টি শব্দে দোয়া ও স্মরণের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ আদব বর্ণিত হয়েছে। প্রথমত অপারকতা ও অক্ষমতা এবং বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করে দোয়া করা; এটা কবুল হওয়ার জন্য জরুরী শর্ত। দোয়ার ভাষাও অক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। বলার ভঙ্গি এবং দোয়ার আকার-আকৃতিও বিনয় ও নম্রতাসূচক হওয়া চাই। এতে বোঝা যায় যে, আজকাল জনসাধারণ যে ভঙ্গিতে দোয়া প্রার্থনা করে প্রথমত একে দোয়া-প্রার্থনা বলাই যায় না, বরং দোয়া পাঠ করা বলা উচিত। কেননা, প্রায়ই জানা থাকে না যে, মুখে যেসব শব্দ উচ্চারণ করা হচ্ছে, সেগুলির অর্থ কি? আজকাল সাধারণ মসজিদসমূহে এটি ইমামদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। তাদের কতিপয় আরবী বাক্য মুখস্থ থাকে এবং নামায শেষে সেগুলোই আবৃত্তি করা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বয়ং ইমামদেরও এসব শব্দের অর্থ জানা থাকে না। তাদের জানা থাকলেও মুক্তাদীরা সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকে। তারা অর্থ না বুঝেই ইমামের আবৃত্তি করা বাক্যাবলীর সাথে সাথে 'আমীন' 'আমীন' বলতে থাকে। এই আগাগোড়া প্রহসনের সারমর্ম কতিপয় বাক্যের আবৃত্তি ছাড়া কিছুই নয়। দোয়া প্রার্থনার যে স্বরূপ, তা এক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। এটা ভিন্ন কথা যে, আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কৃপায় এসব নিষ্প্রাণ বাক্যগুলোও কবুল করে নিতে পারেন। কিন্তু একথা বোঝা দরকার যে, দোয়া প্রার্থনার বিষয়, পাঠ করার বিষয় নয়। কাজেই চাওয়ার যথার্থ রীতি অনুযায়ীই চাইতে হবে।

এছাড়া যদি কারও নিজের উচ্চারিত বাক্যাবলীর অর্থও জানা থাকে এবং তা বুঝেসুঝে বলে, তবে বলার ভঙ্গি এবং বাহ্যিক আকার-আকৃতিতে বিনয় ও নম্রতা ফুটে না উঠলে এ দোয়াও দাবীতে পরিণত হয়, যা করার অধিকার কোন বান্দারই নেই।

মোট কথা, প্রথম শব্দে দোয়ার প্রাণ এরূপ ব্যক্ত হয়েছে যে, স্বীয় অক্ষমতা, দীনতা-হীনতা এবং বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করে আল্লাহর কাছে অভাব-অনটন ব্যক্ত করা। দ্বিতীয়

শব্দে আরও একটি নির্দেশ রয়েছে যে, চুপি চুপি ও সংগোপনে দোয়া করা। এটাই উত্তম এবং কবূলের নিকটবর্তী। কারণ, উচ্চৈঃস্বরে দোয়া চাওয়ার মধ্যে প্রথমত বিনয় ও নম্রতা বিদ্যমান থাকা কঠিন। দ্বিতীয়ত, এতে রিয়া ও সুখ্যাতির আকাঙ্ক্ষা থাকার আশংকাও রয়েছে। তৃতীয়ত, এতে প্রকাশ পায় যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি একথা জানে না যে, আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশ্রোতা ও মহাজ্ঞানী, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সবই তিনি জানেন এবং সরব ও নীরব সব কথাই তিনি শোনেন। এ কারণেই খয়বর যুদ্ধের সময় দোয়া করতে গিয়ে সাহাবায়ে-কিরামের আওয়ায উচ্চ হয়ে গেলে রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ তোমরা কোন বধিরকে অথবা অনুপস্থিতকে ডাকাডাকি করছ না যে, এত জোরে বলতে হবে; বরং একজন সূক্ষ্ম শ্রোতা ও নিকটবর্তীকে সম্বোধন করছ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলাকে, তাই সজোরে বলা অর্থহীন। স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা জনৈক সৎকর্মীর দোয়া উল্লেখ করে বলেন ঃ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا অর্থাৎ যখন সে পালনকর্তাকে অনুচ্চস্বরে ডাকল। এতে বোঝা যায় যে, অনুচ্চস্বরে দোয়া করা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট পছন্দনীয়।

হযরত হাসান বসরী (র) বলেন ঃ প্রকাশ্যে ও সজোরে দোয়া করা এবং নীরবে ও অনুচ্চ স্বরে দোয়া করা—এতদুভয়ের ফযীলতে ৭০ ডিগ্রী তফাত রয়েছে। পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দ অধিকাংশ সময় আল্লাহর স্মরণে ও দোয়ায় মশগুল থাকতেন, কিন্তু কেউ তাঁদের আওয়ায শুনতে পেত না। বরং তাঁদের দোয়া একান্তভাবে তাঁদের ও আল্লাহ্র মধ্যে সীমিত থাকত। তাঁদের অনেকেই সমগ্র কোরআন মুখস্থ তিলাওয়াত করতেন, কিন্তু অন্য কেউ টেরও পেত না। অনেকেই প্রভূত ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করতেন, কিন্তু মানুষের কাছে তা প্রকাশ করে বেড়াতেন না। অনেকেই রাতের বেলায় স্বগৃহে দীর্ঘ সময় নামায পড়তেন, কিন্তু আগন্তুকরা তা বুঝতেই পারত না। হযরত হাসান বসরী (র) আরও বলেন ঃ আমি এমন অনেককে দেখেছি, যারা গোপনে সম্পাদন করার মত কোন ইবাদত কখনও প্রকাশ্যে করেন নি। দোয়ায় তাঁদের আওয়ায অত্যন্ত অনুচ্চ হত।—(ইবনে কাসীর, মাযহারী)

ইবনে জুরাইজ বলেন ঃ দোয়ায় আওয়াযকে উচ্চ করা এবং শোরগোল করা মাকরূহ্। আবূ বকর জাস্সাস হানাফী 'আহ্কামুল-কোরআন' গ্রন্থে বলেন ঃ এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, নীরবে দোয়া করা জোরে দোয়া করার চাইতে উত্তম। হাসান বসরী (র) ও ইবনে-আব্বাস (রা) থেকেও একথাই বর্ণিত রয়েছে। এ আয়াত থেকে আরও জানা যায় যে, নামাযে সূরা ফাতিহার শেষে 'আমীনও' আস্তে বলা উত্তম। কারণ, এটিও একটি দোয়া।

এ যুগের পেশ ইমামদের আল্লাহ্ তা'আলা হিদায়ত করুন। তাঁরা কোরআনের এ শিক্ষা ও পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দের নির্দেশ সম্পূর্ণ ত্যাগ করে বসেন। প্রত্যেক নামাযের পর দোয়ার একটি প্রহসন হয়ে থাকে। সুউচ্চ স্বরে কিছু পাঠ করা হয়, যা আদব ও দোয়ার পরিপন্থী হওয়া ছাড়াও ঐ সব নামাযীর নামাযেও বিঘ্ন সৃষ্টি করে, যাঁরা মসবুক (অর্থাৎ পরে এসে শরীক) হওয়ার কারণে ইমামের নামায সমাপ্ত হওয়ার পর নিজেদের নামায আদায়

করেন। এ প্রথার বহুল প্রচলনের ফলে এর অনিষ্টের দিকটি তাদের দৃষ্টি থেকে উধাও হয়ে গেছে। বিশেষ ক্ষেত্রে অনেক লোক দ্বারা কোন বিশেষ দোয়া করানোর সময় একজন কিছু জোরে দোয়ার বাক্য বলবে এবং অন্যরা 'আমীন' বলবে--এতে দোষ নেই। তবে শর্ত হল এই যে, অন্যের নামায ও ইবাদতে যেন বিঘ্ন সৃষ্টি না হয় এবং একে যেন অভ্যাসে পরিণত করা না হয়, যাতে জনগণ একেই দোয়ার সঠিক পদ্ধতি মনে করে বসতে পারে। বস্তুত আজকাল সাধারণভাবে তা-ই হচ্ছে।

অভাব-অনটনের ব্যাপারে দোয়া করা সম্পর্কে এ পর্যন্ত বর্ণনা করা হল। আয়াতে যদি দোয়ার অর্থ যিকির ও ইবাদত নেওয়া হয়, তবে এ সম্পর্কেও পূর্ববর্তী মনীষীদের সুনিশ্চিত অভিমত এই যে, নীরব যিকির সরব যিকির অপেক্ষা উত্তম। সূফীগণের মধ্যে চিশতিয়া তরীকার বুযুর্গরা মুরীদকে প্রথম পর্যায়ে সরব যিকির শিক্ষা দেন। তাঁরা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অবস্থার প্রতিকার হিসাবে এরূপ করেন, যাতে শব্দের মাধ্যমে অলসতা দূর হয়ে যায় এবং যিকিরের সাথে আত্মার সম্পর্ক সৃষ্টি হতে পারে। নতুবা সরব যিকির জায়েয হলেও তা তাঁদের কাম্য নয়। অবশ্য এর বৈধতাও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে। এ বৈধতার জন্য রিয়া ও সুখ্যাতি অর্জন উদ্দেশ্য না হওয়া শর্ত।

ইমাম আহমদ, ইবনে হাব্বান ও বায়হাকী প্রমুখ হযরত সা'দ ইবনে আবী-ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ خيرا لذ كرا لخفى و خير الرزق ما يكفى অর্থাৎ নীরব যিকির উত্তম এবং ঐ রিযিক উত্তম যা যথেষ্ট হয়ে যায়।

তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ও সময়ে সরব যিকিরও কাম্য ও উত্তম। রসূলুল্লাহ্ (সা) স্বীয় উক্তি ও কর্ম দ্বারা এসব অবস্থা ও সময় বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। উদাহরণত আযান ও ইকামত উচ্চৈঃস্বরে বলা, সরব নামাযসমূহে উচ্চৈঃস্বরে কোরআন তিলাওয়াত করা, নামাযের তকবীর, তাশরীকের তকবীর এবং হজ্জে লাব্বাইকা উচ্চৈঃস্বরে বলা ইত্যাদি। এ কারণেই এ সম্পর্কে ফিকহ্‌বিদদের সিদ্ধান্ত এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) যেসব বিশেষ অবস্থা ও স্থানে কথা ও কর্মের মাধ্যমে সরব যিকির করার শিক্ষা দিয়েছেন, সেখানে সজোরেই তা করা উচিত। এছাড়া অন্যান্য অবস্থা ও স্থানে নীরব যিকিরই উত্তম ও অধিক উপকারী।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ انه لا يحب المعتدين

শব্দটি اعتداء থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সীমা অতিক্রম করা। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা সীমা অতিক্রমকারীদের পছন্দ করেন না। তা দোয়ার সীমা অতিক্রম করাই হোক কিংবা অন্য কোন কাজে---কোনটিই আল্লাহ্‌র পছন্দনীয় নয়। চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, সীমা ও শর্তাবলী পালন ও আনুগত্যের নামই ইসলাম। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ও অন্যান্য লেনদেনে শরীয়তের সীমা অতিক্রম করলে সেগুলো ইবাদতের পরিবর্তে গোনাহে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

দোয়ায় সীমা অতিক্রম করা কয়েক প্রকারে হতে পারে। এক. দোয়ায় শাব্দিক লৌকিকতা, ছন্দ ইত্যাদি অবলম্বন করা। এতে বিনয় ও নম্রতা ব্যাহত হয়। দুই. দোয়ায়

অনাবশ্যক শর্ত সংযুক্ত করা। যেমন বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মুগাফফাল (রা) স্বীয় পুত্রকে এভাবে দোয়া করতে দেখলেন ঃ 'হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে জান্নাতে সাদা রঙের ডান দিকস্থ প্রাসাদ প্রার্থনা করি।' তিনি পুত্রকে বারণ করে বললেন ঃ দোয়ায় এ ধরনের শর্ত যুক্ত করা সীমা অতিক্রম, কোরআন ও হাদীসে তা নিষিদ্ধ।—(মাযহারী)

তিন. মুসলমান জনসাধারণের জন্য বদদোয়া করা কিংবা এমন কোন বিষয় কামনা করা, যা সাধারণ লোকের জন্য ক্ষতিকর এবং এমনিভাবে এখানে উল্লিখিত দোয়ায় বিনা প্রয়োজনে আওয়ায উচ্চ করাও এক প্রকার সীমা অতিক্রম।—(তফসীরে-মাযহারী, আহকামুল-কুরআন)

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ঃ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

এখানে فساد ও صلاح দু'টি পরস্পরবিরোধী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। صلاح শব্দের অর্থ সংস্কার এবং فساد শব্দের অর্থ অনর্থ ও গোলযোগ। ইমাম রাগিব মুফরাদাত-তুল-কোরআন গ্রন্থে বলেন ঃ সমতা থেকে বের হয়ে যাওয়াকেই فساد বলা হয়; তা সামান্য বের হোক কিংবা বেশী। কম বের হলে কম ফাসাদ এবং বেশী বের হলে বেশী ফাসাদ হবে। فساد শব্দের অর্থ অনর্থ সৃষ্টি করা এবং اصلاح শব্দের অর্থ সংস্কার করা। কাজেই আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় এই যে, পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করো না আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক সংস্কার করার পর।

ইমাম রাগিব বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার সংস্কার কয়েক প্রকারে হতে পারে। এক. প্রথমেই জিনিসটি সঠিকভাবে সৃষ্টি করা। যেমন, বলা হয়েছে ঃ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ দুই. অনর্থ আসার পর তা দূর করা। যেমন وَيُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ তিন. সংস্কারের নির্দেশ দান করা। আয়াতে বলা হয়েছে, যখন আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীর সংস্কার সাধন করছেন, তখন তোমরা তাতে অনর্থ সৃষ্টি করো না। এখানে পৃথিবীর সংস্কার সাধন করার দু'টি অর্থ হতে পারে। এক. বাহ্যিক সংস্কার; অর্থাৎ পৃথিবীকে চাষাবাদ ও বৃক্ষ রোপণের উপযোগী করেছেন, তাতে মেঘের সাহায্যে পানি বর্ষণ করে মাটি থেকে ফল-ফুল উৎপন্ন করেছেন এবং মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তুর জন্য মাটি থেকে জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সৃষ্টি করেছেন।

দুই. পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ ও অর্থগত সংস্কার করেছেন। পয়গম্বর, গ্রন্থ ও হিদায়ত প্রেরণ করে পৃথিবীকে কুফর, শিরক ও পাপাচার থেকে পবিত্র করেছেন। আয়াতে উভয় অর্থ, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সংস্কারও উদ্দিষ্ট হতে পারে। অতএব আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে পৃথিবীর সংস্কার সাধন করেছেন। এখন তোমরা এতে গোনাহ্ ও অবাধ্যতার মাধ্যমে গোলযোগ ও অনর্থ সৃষ্টি করো না।

ভূ-পৃষ্ঠের সংস্কার ও অনর্থের মর্ম ঃ সংস্কার যেমন দু'রকম---বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ, তেমনি অনর্থও দু'রকম। ভূপৃষ্ঠের বাহ্যিক সংস্কার এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা একে এমন এক পদার্থরূপে সৃষ্টি করেছেন, যা পানির মত নরমও নয় যে, যাতে কোন কিছু স্থিতাবস্থা লাভ করতে পারে না এবং পাথরের মত শক্তও নয় যে, খনন করা যাবে না। বরং এক মধ্যবর্তী অবস্থায় রেখেছেন যাতে মানুষ একে চাষাবাদের মাধ্যমে নরম করে নিয়ে বৃক্ষ ও ফলফুল উৎপন্ন করতে পারে এবং খনন করে কূপ, পরিখা ও নদীনালা তৈরী করতে পারে ও গৃহের ভিত্তি স্থাপন করতে পারে। এরপর মাটির ভেতরে ও বাইরে আবাদ করার উপকরণ সৃষ্টি করেছেন, যাতে শস্য, তরিতরকারি, উদ্ভিদ ও ফলফুল উৎপন্ন হয়। বাইরে বাতাস, আলো, ঠাণ্ডা ও উত্তাপ সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর মেঘমালার মাধ্যমে তাতে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন, যার ফলে বৃক্ষ উৎপন্ন হতে পারে। বিভিন্ন নক্ষত্র ও গ্রহপুঞ্জের শীতল ও উত্তপ্ত কিরণ নিক্ষেপ করে ফুল ও ফলে রঙ ও রস ভরে দেওয়া হয়েছে। মানুষকে জ্ঞানবুদ্ধি দান করা হয়েছে, যদ্দ্বারা সে মৃত্তিকাজাত কাঁচামাল কাঠ, লোহা, তামা, পিতল, এলুমিনিয়াম ইত্যাদিকে জোড়া দিয়ে শিল্পদ্রব্যের এক নতুন জগত সৃষ্টি করেছে। এগুলো ভূ-পৃষ্ঠের বাহ্যিক সংস্কার এবং আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অসীম শক্তির বলে তা সাধন করেছেন।

অভ্যন্তরীণ ও আত্মিক সংস্কার হচ্ছে আল্লাহ্র স্মরণ, আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা এবং তাঁর আনুগত্যের উপর নির্ভরশীলতা। এর জন্য আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমে প্রতিটি মানুষের অন্তরে আনুগত্য ও স্মরণের একটি সূক্ষ্ম প্রেরণা নিহিত রেখেছেন ঃ فالهمها فجورها وتقواها---(আল্লাহ্ মানুষকে পাপাচার ও আল্লাহ্-ভীতি এতদুভয়েরই অনুপ্রেরণা দান করেছেন)। মানুষের চারপাশের প্রতিটি বস্তুর মধ্যে অসীম শক্তি ও বিস্ময়কর কারিগরির এমন বহিঃপ্রকাশ রেখেছেন, যেগুলো দেখে সামান্য বুদ্ধি-বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তিও বলে উঠে ঃ فتبارك الله احسن الخالقين (সমুচ্চ হোন সুন্দরতম স্রষ্টা)। এছাড়া রসূল প্রেরণ করেছেন এবং ধর্মগ্রন্থ নাযিল করেছেন। এভাবে স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক স্থাপনের পুরোপুরি ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এভাবে যেন ভূ-পৃষ্ঠের পরিপূর্ণ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সংস্কার হয়ে গেছে। এখন নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে ঃ আমি এ ভূ-পৃষ্ঠকে ঠিকঠাক করে দিয়েছি। তোমরা একে নষ্ট করো না।

সংস্কারের যেমন বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দু'টি রূপ বর্ণিত হয়েছে, তেমনি এর বিপরীতে ফাসাদ বা অনথ সৃষ্টিরও বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দু'টি প্রকার রয়েছে। আলোচ্য আয়াত দ্বারা ফাসাদের উভয় প্রকারই নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

কোরআন ও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আসল ও প্রধান কর্তব্য হচ্ছে অভ্যন্তরীণ সংস্কার সাধন এবং অভ্যন্তরীণ অনর্থ সৃষ্টিকে প্রতিরোধ করা। কিন্তু এ জগতে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ

সংস্কার ও ফাসাদের মধ্যে এমন নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে যে, একটির ফাসাদ অন্যটি ফাসাদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই শরীয়ত অভ্যন্তরীণ ফাসাদের দ্বার যেমন রুদ্ধ করেছে, তেমনি বাহ্যিক ফাসাদকেও প্রতিরোধ করেছে। চুরি, ডাকাতি, হত্যা এবং যাবতীয় অশ্লীল কার্যকলাপ জগতে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ ফাসাদ সৃষ্টি করে। তাই এসব বিষয়ের উপর বিশেষভাবে নিষেধাজ্ঞা ও কঠোর শাস্তি আরোপ করা হয়েছে এবং অপরাধমূলক সকল আচরণকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেননা, প্রত্যেকটি অপরাধ ও পাপ কাজই কোথাও বাহ্যিক ফাসাদ সৃষ্টি করে এবং কোথাও অভ্যন্তরীণ অনর্থের কারণ হয়। চিন্তা করলে দেখা যায়, প্রতিটি বাহ্যিক ফাসাদ অভ্যন্তরীণ ফাসাদের কারণ হয় এবং প্রতিটি অভ্যন্তরীণ ফাসাদ বাহ্যিক ফাসাদ ডেকে আনে।

বাহ্যিক ফাসাদ যে অভ্যন্তরীণ ফাসাদের কারণ হয়, তা বলাই বাহুল্য। কারণ বাহ্যিক ফাসাদ হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশাবলীর বিরুদ্ধাচরণ। বস্তুত আল্লাহ্র নাফরমানীরই অপর নাম অভ্যন্তরীণ ফাসাদ। তবে অভ্যন্তরীণ ফাসাদ যে বাহ্যিক ফাসাদ ডেকে আনে, তা বোঝা কিছুটা চিন্তাসাপেক্ষ ব্যাপার। কারণ, এ বিশ্বচরাচর ও এর প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র-বৃহৎ বস্তু আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্ট এবং তাঁর আজ্ঞাধীন। মানুষ যত দিন আল্লাহ্ তা'আলার আজ্ঞাধীন থাকে, তত দিন এসব বস্তুও মানুষের খাদেম হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে মানুষ যখন আল্লাহ্ তা'আলার অবাধ্যতা করতে শুরু করে, তখন জগতের প্রত্যেকটি বস্তু অজান্তে ও পরোক্ষভাবে মানুষেরও অবাধ্য হয়ে ওঠে, যা মানুষ বাহ্যত চর্মচক্ষে দেখে না। কিন্তু এসব বস্তুর প্রভাব, বৈশিষ্ট্য, পরিণাম ও উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য করলে এর জাজ্বল্যমান প্রমাণ পাওয়া যায়।

বাহ্যত জগতের সব বস্তুই মানুষের ব্যবহারে এসে থাকে। পানি কণ্ঠনালীতে পৌঁছে পিপাসা নিবৃত্ত করতে অস্বীকার করে না। খাদ্য ক্ষুধা দূর করতে বিরত হয় না। পোশাক-পরিচ্ছদ ও বাসগৃহ শীত ও গ্রীষ্মে সুখ সরবরাহ করতে অস্বীকৃত হয় না।

কিন্তু পরিণাম চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, এসবের কোন একটি বস্তুও স্বীয় কর্তব্য পুরোপুরি পালন করছে না। কেননা, এসব বস্তু ও এসবের ব্যবহারে আসল উদ্দেশ্য আরাম ও সুখ লাভ করা, অস্থিরতা ও কষ্ট দূর হওয়া এবং অসুখে-বিসুখে রোগমুক্তি অর্জিত হওয়া। অথচ তা হচ্ছে না।

এখন জগতের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবেন যে, আজকাল আরাম-আয়েশ ও রোগমুক্তির উপায়-উপকরণের ধারণাতীত প্রাচুর্য সত্ত্বেও মানবগোষ্ঠী অস্থিরতা ও রোগ-ব্যাধির শিকার হচ্ছে। নতুন নতুন রোগ-ব্যাধি ও বিপদাপদ ভিড় জমাচ্ছে। কোন ধনকুবেরও স্বস্থানে নিশ্চিন্ত ও তৃপ্ত নয়। বরং এসব উপায়-উপকরণ যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, সে হারেই বিপদাপদ, রোগ-ব্যাধি ও অস্থিরতাও বেড়ে চলছে। مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی (যতই ঔষধ প্রয়োগ করা হল ততই রোগ বাড়তে থাকল)।

আজ বিদ্যুৎ, বাষ্প ও অন্যান্য বস্তুনিসৃত চাকচিক্যে বিমোহিত মানুষ যদি এসব

বস্তুর উর্ধ্বে উঠে চিন্তা করে, তবে বোঝা যাবে যে, আমাদের সব প্রচেষ্টা, সব শিল্প ও আবিষ্কারই আমাদের আসল লক্ষ্য অর্থাৎ সুখ ও শান্তি দানে ব্যর্থ হয়েছে। এই অভ্যন্তরীণ কারণ ছাড়া এর অন্য কোন কারণ নেই যে, আমরা স্বীয় পালনকর্তা ও প্রভুর অবাধ্যতার পথ বেছে নিয়েছি। ফলে তাঁর সৃষ্ট বস্তুসমূহও অলক্ষ্যে আমাদের অবাধ্যতা শুরু করেছে।

چوں از وگشتی همه چیز از توگشت (তুমি যখন তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ, তখন সব বস্তুই তোমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে)। তারা এখন আমাদের জন্য সত্যিকার সুখ ও শান্তি সরবরাহ করছে না। মাওলানা রূমী চমৎকার বলছেন ঃ

خاک و باد واب وآتش بندہ اند — با من وتو مردہ با حق زندہ اند

(মাটি, বাতাস, পানি ও আগুন আল্লাহ্‌র দাস। তারা আমার ও তোমার কাছে মৃত হলেও আল্লাহ্‌র কাছে জীবিত)।

অর্থাৎ জগতের এসব বস্তুকে বাহ্যত প্রাণহীন ও চেতনাহীন বলে মনে হলেও প্রকৃত-পক্ষে প্রভুর আজ্ঞাধীন হয়ে কাজ করার উপলব্ধি তাদেরও রয়েছে।

সারকথা চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, প্রতিটি গোনাহ্ ও আল্লাহ্ তা'আলার প্রত্যেকটি অবাধ্যতা দুনিয়াতে শুধু অভ্যন্তরীণ অনর্থই সৃষ্টি করে না, বরং বাহ্যিক অনর্থও এর অবশ্য-ম্ভাবী পরিণতি হয়ে থাকে। মওলানা রূমী বলেছেন ঃ

ابر نايد از پئے منع زكوة — وززنا افتد وبا اندر جهات

এটা কোন কবির কল্পনা নয় বরং এমন একটি বাস্তব সত্য, কোরআন ও হাদীস যার সাক্ষ্য। শাস্তির হালকা নমুনাই এ জগতে রোগ-ব্যাধি, মহামারী, ঝড় ও বন্যার আকারে দেখা দিয়ে থাকে।

তাই لَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا——বাক্যের অর্থে যেমন জগতে বাহ্যিক ফাসাদ সৃষ্টিকারী গোনাহ ও অপরাধসমূহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তেমনি আল্লাহ্ তা'আলার যাবতীয় অবাধ্যতাই এর অন্তর্ভুক্ত। তাই আলোচ্য আয়াতে অতঃপর বলা হয়েছে ঃ وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا——অর্থাৎ আল্লাহ্‌কে ভয় ও আশা সহকারে ডাক।

অর্থাৎ একদিকে দোয়া অগ্রাহ্য হওয়ার ভয় থাকবে এবং অপরদিকে তাঁর করুণা লাভের পূর্ণ আশাও থাকবে। এ আশা ও ভয়ই দৃঢ়তার পথে মানবাত্মার দু'টি বাহু। এ বাহুদ্বয়ের সাহায্যে সে উর্ধ্বলোকে আরোহণ করে এবং সুউচ্চ পদমর্যাদা অর্জন করে।

এ বাক্য থেকে বাহ্যত প্রতীয়মান হয় যে, আশা ও ভয় সমান সমান হওয়া উচিত। কোন কোন আলিম বলেন, জীবিতাবস্থায় ও সুস্থতার সময় ভয়কে প্রবল রাখা প্রয়োজন; যাতে আনুগত্যে ত্রুটি না হয়। আর যখন মৃত্যু নিকটবর্তী হয়, তখন আশাকে প্রবল রাখবে।

কেননা, এখন কাজ করার শক্তি বিদায় নিয়েছে। করুণা লাভের আশা করাই এখন তার একমাত্র কাজ।—(বাহ্‌রে-মুহীত)

কোন কোন সূক্ষ্মদর্শী আলিম বলেনঃ ধর্মের বিশুদ্ধ পথে অটল থাকা এবং সর্বক্ষণ আল্লাহ্‌র আনুগত্য করাই প্রকৃত লক্ষ্য। মানুষের মেজাজ ও স্বভাব বিভিন্ন রূপ। কেউ ভয়ের প্রবলতার দ্বারা এ লক্ষ্য অর্জন করতে পারে, আবার কেউ মহব্বত ও আশার প্রবলতার দ্বারা। যার জন্য যে অবস্থা লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হয়, সে তাই হাসিল করতে সচেষ্ট হবে।

মোট কথা, পরবর্তী আয়াতে দোয়ার দু'টি আদব বর্ণিত হয়েছে। এক. বিনয় ও নম্রতা সহকারে দোয়া করা এবং দুই. মৃদু স্বরে ও সংগোপনে দোয়া করা। এ দু'টি গুণই মানুষের বাহ্যিক দেহের সাথে সম্পৃক্ত। কেননা, বিনয়ের অর্থ হল দোয়ার সময় দৈহিক আকার-আকৃতিকে অপারক ও ফকীরের মত করে নেওয়া, অহংকারী ও বেপরোয়ার মত না হওয়া। দোয়া সংগোপনে করার সম্পর্কও মুখ ও জিহ্‌বার সাথে যুক্ত।

এ আয়াতে দোয়ার আরও দু'টি অভ্যন্তরীণ আদব বর্ণিত হয়েছে। এগুলোর সম্পর্ক মানুষের মনের সাথে। আর তা হল এই যে, দোয়াকারীর মনে এ আশংকা থাকা উচিত যে, সম্ভবত দোয়াটি গ্রাহ্য হবে না এবং এ আশাও থাকা উচিত যে, দোয়া কবুল হতে পারে। কেননা, পাপ ও গোনাহ্‌ থেকে নিশ্চিত হয়ে যাওয়াও ঈমানের পরিপন্থী। অপর দিকে আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যাওয়াও কুফর। এতদুভয়ের মধ্যবর্তী অবস্থায় থাকলেই দোয়া কবুল হবে বলে আশা করা যায়।

অতঃপর আয়াতের শেষে বলা হয়েছেঃ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলার করুণা সৎ কর্মীদের নিকটবর্তী। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যদিও দোয়ার সময় ভয় ও আশা উভয় অবস্থাই থাকা বাঞ্ছনীয় কিন্তু এতদুভয়ের মধ্যে আশার দিকটিই থাকবে প্রবল। কেননা, বিশ্ব-পালনকর্তা পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র দান ও অনুগ্রহে কোন ত্রুটি ও কৃপণতা নেই। তিনি মন্দের চেয়ে মন্দ লোক, এমনকি শয়তানের দোয়াও কবুল করতে পারেন। কবুল না হওয়ার আশংকা একমাত্র স্বীয় কুকর্ম ও গোনাহ্‌র অকল্যাণেই থাকতে পারে। কারণ, আল্লাহ্‌র রহমতের নিকটবর্তী হওয়ার জন্য সৎকর্মী হওয়া প্রয়োজন।

এ কারণেই রসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেছেনঃ কেউ কেউ সুদীর্ঘ সফর করে স্বীয় বেশভূষা ফকীরের মত করে আল্লাহ্‌র সামনে দোয়ার হস্ত প্রসারিত করে ; কিন্তু তাদের খাদ্য ও পোশাক সবই হারাম দ্বারা সংগৃহীত---এরূপ লোকের দোয়া কিরূপে কবুল হতে পারে?---(মুসলিম, তিরমিযী)

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেনঃ বান্দা যতক্ষণ কোন গোনাহ্‌ অথবা আত্মীয়তার সম্পর্কছেদের দোয়া না করে এবং তড়িঘড়ি না করে, ততক্ষণ তার দোয়া কবুল হতে থাকে। সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেনঃ তড়িঘড়ি দোয়া করার অর্থ কি? তিনি বললেনঃ এর অর্থ হল এরূপ ধারণা করা যে, আমি এত দীর্ঘ দিন থেকে দোয়া করছি, অথচ এখনো পর্যন্ত কবুল হল না। অতঃপর নিরাশ হয়ে দোয়া ত্যাগ করা।---(মুসলিম, তিরমিযী)

অন্য এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ যখন আল্লাহ্র কাছে দোয়া করবে তখন কবুল হওয়ার ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হয়ে দোয়া করবে।

অর্থাৎ আল্লাহ্র রহমতের বিস্তৃতিকে সামনে রেখে দোয়া করলে অবশ্যই দোয়া কবুল হবে বলে মনকে মজবুত করা। এমন মনে করা গোনাহ্র কারণে দোয়া কবুল না হওয়ার আশংকা অনুভব করার পরিপন্থী নয়।

وَهُوَ الَّذِيْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ ۭ حَتّٰٓى
اِذَآ اَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاۗءَ
فَاَخْرَجْنَا بِهٖ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ۭ كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰى لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُوْنَ ۝ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهٗ بِاِذْنِ رَبِّهٖ ۚ وَالَّذِيْ خَبُثَ
لَا يَخْرُجُ اِلَّا نَكِدًا ۭ كَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّشْكُرُوْنَ ۝

(৫৭) তিনিই বৃষ্টির আগে সুসংবাদবাহী বায়ু পাঠিয়ে দেন। এমনকি যখন পানি-পূর্ণ মেঘমালা বয়ে আনে, তখন আমি এগুলোকে একটি মৃত জনপদের দিকে পাঠিয়ে দিই। অতঃপর এ মেঘ থেকে বৃষ্টিধারা বর্ষণ করি। অতঃপর পানি দ্বারা সব রকমের ফল উৎপন্ন করি! এমনিভাবে মৃতদেরকে বের করব---যাতে তোমরা চিন্তা কর। (৫৮) যে ভূখণ্ড উৎকৃষ্ট, তার ফসল তার পালনকর্তার নির্দেশে উৎপন্ন হয় এবং যা নিকৃষ্ট তাতে অল্পই ফসল উৎপন্ন হয়। এমনিভাবে আমি আয়াতসমূহ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বর্ণনা করি কৃতজ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্য।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং তিনিই (আল্লাহ্) স্বীয় বৃষ্টির পূর্বে বায়ু প্রেরণ করেন, তা (বৃষ্টির আশা দিয়ে মনকে) প্রফুল্ল করে দেয়; এমনকি, যখন বায়ুরাশি পানিপূর্ণ মেঘমালা বয়ে আনে, তখন আমি মেঘমালাকে কোন শুষ্ক ভূখণ্ডের দিকে পরিচালিত করি, অতঃপর এ মেঘ থেকে বৃষ্টিধারা বর্ষণ করি, অতঃপর পানি দ্বারা সব রকম ফল উদগত করি। (এতে আল্লাহ্ তা'আলার একত্ব-বাদ এবং মৃতকে জীবিত করার সর্বময় শক্তি প্রমাণিত হয়। তাই বলেছেনঃ) এমনিভাবে (কিয়ামতের দিন) আমি মৃতদেরকে (মাটির ভেতর থেকে) বের করব (এসব এজন্য শুনানো হল) যাতে তোমরা বুঝ [এবং কোরআন ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র হিদায়ত যদিও সবার জন্য ব্যাপক, কিন্তু তা থেকে কম লোকই উপকার লাভ করে। এর দৃষ্টান্ত ঐ বৃষ্টি দ্বারা বোঝা, যা সর্বত্র বর্ষিত হয়; কিন্তু ফসল ও বৃক্ষ সর্বত্র উৎপন্ন হয় না, বরং তা শুধু এমন

ক্ষেত্রেই উৎপন্ন হয়, যা উর্বর। এ কারণেই বলেছেন ঃ] এবং যা উৎকৃষ্ট ভূখণ্ড, তার ফসল তো আল্লাহ্‌র নির্দেশে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং যা নিকৃষ্ট, তার ফসল (যদি উৎপন্ন হয়ও, তবে) খুব অল্পই উৎপন্ন হয়। এমনিভাবে আমি (সর্বদা) প্রমাণাদিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বর্ণনা করে থাকি (অবশ্য সেগুলো) তাদেরই জন্য, (উপকারী হয়) যারা (এ-গুলোকে) মর্যাদা দেয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বিশেষ ও বড় নিয়ামতসমূহ উল্লেখ করেছি-লেন। নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল, দিবারাত্র, চন্দ্র-সূর্য ও নক্ষত্রমণ্ডলীর সৃষ্টি এবং মানুষের প্রয়ো-জনাদি সরবরাহে ও সেবায় এগুলোর নিয়োজিত থাকার কথা উল্লেখ করে এ ব্যাপারে হুঁশিয়ার করেছিলেন যে, যখন এক পবিত্র সত্তাই যাবতীয় প্রয়োজন ও সুখ-শান্তির উপকরণ সৃষ্টি করেছেন, তখন যে কোন অভাব-অনটন ও প্রয়োজনে তাঁর কাছেই দোয়া প্রার্থনা করা উচিত এবং তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকেই সাফল্যের চাবিকাঠি বলে মনে করা কর্তব্য।

আলোচ্য প্রথম আয়াতেও এমনি ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ও বড় নিয়ামতের কথা উল্লিখিত হয়েছে। এসব নিয়ামতের উপরই মানুষ ও পৃথিবীর সব সৃষ্ট জীবের জীবন ও স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। উদাহরণত বৃষ্টি এবং তদ্দ্বারা উৎপন্ন বৃক্ষ, ফসলাদি, তরিতরকারি ইত্যাদি। পার্থক্য এই যে, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ঊর্ধ্ব জগতের সাথে সম্পর্কযুক্ত নিয়ামতসমূহ বর্ণিত হয়েছিল এবং আলোচ্য আয়াতে নিম্ন জগতের সাথে সম্পর্কশীল নিয়ামতসমূহ বর্ণিত হচ্ছে। —(বাহ্‌রে-মুহীত)

দ্বিতীয় আয়াতে বিশেষভাবে একথা বলা হয়েছে যে, আমার এসব বিরাট নিয়ামত যদিও ভূ-খণ্ডের সর্বত্র ব্যাপক ; বৃষ্টি বর্ষিত হলে যদিও পাহাড়, সমুদ্র, উর্বর, অনুর্বর এবং উত্তম ও অনুত্তম সব রকম ভূ-খণ্ডেই সমভাবে বর্ষিত হয়, কিন্তু ফসল, বৃক্ষ ও তরিতরকারি একমাত্র এমন ভূ-খণ্ডেই উৎপন্ন হয়, যাতে উর্বরতা রয়েছে—কঙ্কর ও বালুকাময় ভূখণ্ড এ বৃষ্টির দ্বারা উপকৃত হয় না।

প্রথম আয়াতের ফলাফল ব্যক্ত করা হয়েছে যে, যে পবিত্র সত্তা মৃতবৎ ভূখণ্ডে ফসল উৎ-পাদনের মত জীবনীশক্তি দান করেন, তাঁর পক্ষে যে মানুষ পূর্বে জীবিত ছিল অতঃপর মারা যায়, তার মধ্যে পুনরায় জীবনের স্পন্দন সৃষ্টি করে দেওয়া মোটেই কঠিন নয়। এ ফলা-ফলটি আয়াতে স্পষ্টরূপে বিবৃত হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াত থেকে এরূপ ফলাফল বের করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র হিদায়ত, ঐশী গ্রন্থসমূহ, আম্বিয়া (আ), তাঁদের প্রতিনিধি আলিম ও মাশায়েখের শিক্ষাও বৃষ্টির মত সবার জন্যই ব্যাপক, কিন্তু বৃষ্টি দ্বারা যেমন সব ভূখণ্ডই উপকৃত হয় না তেমনি এ আধ্যাত্মিক বৃষ্টির উপকারও তারাই লাভ করে, যাদের মধ্যে যোগ্যতা রয়েছে। পক্ষান্তরে যাদের অন্তর কঙ্করময় কিংবা বালুকাময়—উৎপাদনের যোগ্যতা বিবর্জিত তারা যাবতীয় সুস্পষ্ট নিদর্শন সত্ত্বেও নিজেদের পথভ্রষ্টতায় অটল থাকে।

এ ফলাফলের দিকেই দ্বিতীয় আয়াতের শেষ বাক্যে ইঙ্গিত করা হয়েছে ঃ كَذٰلِكَ

نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّشْكُرُوْنَ—অর্থাৎ আমি এমনিভাবে স্বীয় প্রমাণাদি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বর্ণনা করি তাদের জন্য, যারা এর মূল্য দেয়। উদ্দেশ্য এই যে, বাস্তবে যদিও এ বর্ণনা সবারই জন্য ব্যাপক; কিন্তু পরিণতির দিক দিয়ে তাদের জন্যই উপকারী প্রমাণিত হয়েছে, যারা যোগ্যতাসম্পন্ন এবং যারা এর মূল্য ও মর্যাদা বুঝে। এভাবে উল্লিখিত আয়াতদ্বয়ে ইহকাল ও পরকালের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। এবার উভয় আয়াতের বিস্তারিত তফসীর শুনুন। প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে ঃ وَهُوَ الَّذِيْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ এতে رياح শব্দটি ريح--এর বহুবচন। এর অর্থ বায়ু। بشرا শব্দের অর্থ সুসংবাদ। এবং রহমত বলে বৃষ্টির রহমত বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলাই বৃষ্টির পূর্বে সুসংবাদ দেওয়ার জন্য বায়ু প্রেরণ করেন।

উদ্দেশ্য এই যে, বৃষ্টির পূর্বে ঠাণ্ডা বায়ু প্রেরণ করা আল্লাহ্র চিরন্তন রীতি। এ বাতাস দ্বারা স্বয়ং মানুষ আরাম ও প্রফুল্লতা অর্জন করে এবং তা যেন আসন্ন বৃষ্টির সংবাদও পূর্বাহ্নে প্রদান করে। অতএব, এ বায়ু দু'টি নিয়ামতের সমষ্টি। এক. স্বয়ং মানুষ ও সাধারণ সৃষ্ট জীবের জন্য উপকারী এবং দুই. বৃষ্টির পূর্বে বৃষ্টির আগমন বার্তা বহনকারী। কেননা, মানুষ একটি নরম ও নাজুক সৃষ্টি; তার অনেক প্রয়োজনীয় কাজ বৃষ্টির কারণে বন্ধ হয়ে যায়। বৃষ্টির সংবাদ পূর্বে পেয়ে সে নিজের ব্যবস্থা সম্পন্ন করে নেয়। এছাড়া স্বয়ং তার অস্তিত্ব এবং তার আসবাবপত্র ও নিজের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করে নেয়।

এরপর বলা হয়েছে ঃ حَتّٰى اِذَا اَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سحاب শব্দের অর্থ মেঘ এবং ثقال শব্দটি ثقيل—এর বহুবচন। এর অর্থ ভারী। অর্থাৎ বায়ু যখন ভারী মেঘমালাকে উপরে উঠিয়ে নেয়। ভারী মেঘমালার অর্থ পানিতে পরিপূর্ণ মেঘমালা—যা বাতাসের কাঁধে সওয়ার হয়ে উপরে উঠে যায়। এভাবে হাজারো মণ ভারী পানি বাতাসে ভর করে উপরে পৌঁছে যায়। বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, এতে কোন মেশিন কাজ করে না এবং কোন মানুষও শ্রম নিয়োগ করে না। আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম হওয়া মাত্র আপনা-আপনি সমুদ্র থেকে বাষ্প (মৌসুমী বায়ু) উত্থিত হতে থাকে এবং উপরে উঠে মেঘমালার আকার ধারণ করে। অতঃপর হাজারো বরং লাখো গ্যালন পানি ভর্তি এ জাহাজ বাতাসের কাঁধে সওয়ার হয়ে আকাশ পানে ধাবিত হয়।

এরপর বলা হয়েছে ঃ سُقْنٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ—سوق—এর অর্থ কোন জন্তুকে হাঁকানো ও চালানো, بلد—এর অর্থ শহর, বস্তি ও জনপদ। আর ميت—এর অর্থ মৃত।

অর্থাৎ বাতাস যখন ভারী মেঘমালাকে তুলে নেয়, তখন আমি মেঘমালাকে কোন মৃত

শহরের দিকে পরিচালিত করি। 'মৃত শহর' বলে এমন জনপদকে বোঝানো হয়েছে, যা পানির অভাবে উজাড় প্রায়। এখানে সাধারণ ভূখণ্ডের পরিবর্তে বিশেষভাবে শহর উল্লেখ করা এ জন্য সমীচীন হয়েছে যে, বৃষ্টি-বাদল প্রেরণ ও মাটিকে সিক্ত করার প্রকৃত লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের প্রয়োজন মেটানো। মানুষের বাসস্থান হচ্ছে শহর। নতুবা বন-জঙ্গলের সজীবতা স্বয়ং কোন লক্ষ্য নয়।

এ পর্যন্ত আলোচ্য আয়াতের বিষয়বস্তুর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক প্রমাণিত হল। প্রথমত বৃষ্টি মেঘমালা থেকে বর্ষিত হয়; যেমন দৃশ্যতও তাই। এতে বোঝা গেল যে, যেসব আয়াতে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণের কথা বলা হয়েছে, সেখানেও 'সামা' (আকাশ) শব্দ দ্বারা মেঘমালাকেই বোঝানো হয়েছে। কোন সময় সামুদ্রিক মৌসুমী বায়ুর পরিবর্তে সরাসরি আকাশ থেকে মেঘমালা সৃষ্টি হয়ে বৃষ্টি বর্ষিত হওয়া সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়ত কোন বিশেষ দিক কিংবা বিশেষ ভূখণ্ডের দিকে মেঘমালা ধাবিত হওয়া সরাসরি আল্লাহ্‌র নির্দেশের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তিনি যখন যেখানে ইচ্ছা এবং যে পরিমাণ ইচ্ছা বৃষ্টি বর্ষণের নির্দেশ দান করেন। মেঘমালা আল্লাহ্‌র সে নির্দেশই পালন করে মাত্র।

এ বিষয়টি সর্বত্রই এভাবে প্রত্যক্ষ করা যায় যে, মাঝে মাঝে কোন শহর অথবা জনপদের উপর মেঘমালা পুঞ্জীভূত হয়ে থাকে এবং সেখানে বৃষ্টির প্রয়োজনও থাকে, কিন্তু মেঘমালা সেখানে এক ফোঁটা পানিও দেয় না; বরং আল্লাহ্‌র নির্দেশে যে শহর বা জনপদের প্রাপ্য নির্ধারিত থাকে, সেখানে পৌঁছেই বর্ষিত হয়। নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ছাড়া অন্যত্র মেঘের পানি লাভ করার সাধ্য কারো নেই।

প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞানীরা মৌসুমী বায়ুর গতিপথ নির্ণয়ের জন্য কিছু কিছু বিধি ও মূলনীতি আবিষ্কার করে রেখেছেন। এসবের মাধ্যমে তাঁরা বলে দেন যে, অমুক সাগর থেকে যে মৌসুমী বায়ু উত্থিত হয়েছে তা কোন্ দিকে প্রবাহিত হবে, কোথায় বৃষ্টি বর্ষণ করবে এবং কতটুকু বৃষ্টিপাত হবে। বিভিন্ন দেশে এ ধরনের তথ্য পরিবেশন করার জন্য আবহাওয়া বিভাগ কায়েম করা হয়। কিন্তু অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, আবহাওয়া বিভাগ প্রদত্ত খবরাদি প্রচুর পরিমাণে ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। আল্লাহ্‌র নির্দেশ তাদের বিপরীতে বলে তাদের সব নিয়মকানুনই অকেজো হয়ে যায় এবং মৌসুমী বায়ু তাদের প্রদত্ত খবরের বিপরীতে অন্য কোন দিকে গতি পরিবর্তন করে চলে যায়। ফলে আবহাওয়া বিভাগের নিষ্ফল তাকিয়ে থাকাই সার হয়।

এছাড়া বায়ুর গতিপ্রবাহ নির্ণয়ের জন্য বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত নীতিমালা ও মেঘমালা যে আল্লাহ্ তা'আলার আজ্ঞাধীন---এ বিষয়ের পরিপন্থী নয়। কেননা, বিশ্ব চরাচরের সব কাজ-কারবারে আল্লাহ্‌র চিরন্তন রীতি এই যে, আল্লাহ্‌র নির্দেশ স্বাভাবিক কারণসমূহের আবরণ ভেদ করে প্রকাশ পায়। এসব স্বাভাবিক কারণ দৃষ্টেই মানুষ নীতিমালা প্রণয়ন করে। নতুবা আসল সত্য তাই, যা হাফেয শিরাজী ব্যক্ত করেছেন ঃ

کا رزلف تست مشک افشانی امّا عاشقاں
مصلحت را تہمتے بر اھوئے چین بستہ اند

অতঃপর বলা হয়েছে ঃ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ

অর্থাৎ আমি মৃত জনপদে পানি বর্ষণ করি, অতঃপর পানি দ্বারা সব রকম ফল-ফসল উৎপন্ন করি।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

অর্থাৎ এভাবেই আমি মৃতদেহকে কিয়ামতের দিন উত্থিত করব যাতে তোমরা বুঝ। উদ্দেশ্য এই যে, আমি যেভাবে মৃত ভূখণ্ডকে জীবিত করি এবং তা থেকে বৃক্ষ ও ফল-ফসল নির্গত করি, তেমনিভাবে কিয়ামতের দিন মৃতদেরকে পুনরায় জীবিত করে তুলব। আমি এসব দৃষ্টান্ত এজন্য বর্ণনা করি, যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ পাও।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ কিয়ামতে দু'বার শিঙ্গা ফোঁকা হবে। প্রথম ফুৎকারের পর সারা বিশ্ব ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে, কোন কিছুই জীবিত থাকবে না। দ্বিতীয় ফুৎকারের পর নতুনভাবে সারা বিশ্ব সৃজিত হবে এবং সব মৃত জীবিত হয়ে যাবে। সূরা হাদীদে আরও বলা হয়েছে যে, উভয় বার শিঙ্গা ফুৎকারের মাঝখানে চল্লিশ বছরের ব্যবধান হবে। এ চল্লিশ বছর পর্যন্ত অবিরাম বৃষ্টিপাত হতে থাকবে। এ সময়ের মধ্যেই প্রতিটি মৃত মানুষ ও জন্তুর দেহের অংশ একত্র করে পূর্ণ কাঠামো তৈরী করা হবে। অতঃপর শিঙ্গা ফোঁকার সাথে সাথে এসব মৃতদেহে আত্মা এসে যাবে এবং জীবিত হয়ে দণ্ডায়মান হবে। এ রেওয়ায়েতের বেশীর ভাগ বুখারী ও মুসলিম থেকে এবং কিছু অংশ আবূ দাউদের 'কিতাবুল -বা'ছ থেকে গৃহীত হয়েছে।

দ্বিতীয় আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ

وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا — نكد শব্দের অর্থ ঐ বস্তু, যা অনর্থক এবং সামান্য। অর্থাৎ বৃষ্টির কল্যাণধারা যদিও প্রত্যেক শহর ও ভূখণ্ডে সমভাবে বর্ষিত হয়, কিন্তু ফলাফলের দিক দিয়ে ভূখণ্ড দু'প্রকার হয়ে থাকে। এক. উর্বর ও ভাল—যাতে উৎপাদন ক্ষমতা রয়েছে। এ ধরনের ভূখণ্ড থেকে সর্বপ্রকার ফল-ফসল উৎপন্ন হয়। দুই. শক্ত ও লবণাক্ত ভূখণ্ড। এতে উৎপাদনের যোগ্যতা নেই। এরূপ ভূখণ্ডে একে তো কিছু উৎপন্নই হয় না, আর কিছু হলেও খুব অল্প পরিমাণে হয়। যা উৎপন্ন হয়, তাও অকেজো ও নষ্ট হয়ে থাকে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ

অর্থাৎ আমি স্বীয় শক্তির প্রমাণাদি নানাভাবে বর্ণনা করি তাদের জন্য, যারা এগুলোর মর্যাদা দেয়।

এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, বৃষ্টির কল্যাণধারার মত আল্লাহ্‌র হিদায়ত এবং নিদর্শনাবলীর কল্যাণও সব মানুষের জন্য ব্যাপক; কিন্তু প্রতিটি ভূখণ্ডই যেমন বৃষ্টি থেকে উপকার লাভ করে না, তেমনি প্রতিটি মানুষই এ হিদায়ত থেকে ফায়দা হাসিল করে না; বরং একমাত্র তারাই ফায়দা হাসিল করে, যারা কৃতজ্ঞ ও জ্ঞানসম্পন্ন—এসব নিদর্শনের মর্যাদা দেওয়ার মত যোগ্যতা রাখে।

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ
مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥٩﴾
قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٦٠﴾ قَالَ يَا قَوْمِ
لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦١﴾ أُبَلِّغُكُمْ
رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٢﴾
أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنْكُمْ
لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٦٣﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ
وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۖ
إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ﴿٦٤﴾

(৫৯) নিশ্চয় আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম। সে বলল: হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত আমাদের কোন উপাস্য নেই। আমি তোমাদের জন্য একটি মহাদিবসের শাস্তির আশংকা করি। (৬০) তার সম্প্রদায়ের সর্দাররা বলল: আমরা তোমাকে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতার মাঝে দেখতে পাচ্ছি। (৬১) সে বলল: হে আমার সম্প্রদায়! আমি কখনও ভ্রান্ত নই; বরং আমি বিশ্বপালনকর্তার রসূল। (৬২) তোমাদের পালনকর্তার পয়গাম পৌঁছাই এবং তোমাদের সদুপদেশ দিই। আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এমন সব বিষয় জানি, যেগুলো তোমরা জান না। (৬৩) তোমরা কি আশ্চর্য বোধ করছ যে, তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের মধ্য থেকেই একজনের বাচনিক উপদেশ এসেছে—যাতে সে তোমাদের ভীতি প্রদর্শন করে, যেন তোমরা সংযত হও এবং যেন তোমরা অনুগৃহীত হও। (৬৪) অতঃপর তারা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। আমি তাকে এবং নৌকাস্থিত লোকদেরকে

উদ্ধার করলাম এবং যারা মিথ্যারোপ করত, তাদেরকে ডুবিয়ে দিলাম। নিশ্চয় ওরা ছিল এক অন্ধ জনগোষ্ঠী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি নূহ্ (আ)-কে (পয়গম্বররূপে) তাঁর সম্প্রদায়ের প্রতি পাঠিয়েছিলাম। সে (তাঁর সম্প্রদায়কে) বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা (শুধু) আল্লাহ্রই ইবাদত কর। তিনি ছাড়া কেউ তোমাদের উপাস্য (হওয়ার যোগ্য) নেই (এবং মূর্তির আরাধনা ত্যাগ কর—যাদের নাম সূরা নূহে ওয়াদ, সুয়া, ইয়াগুস, ইয়াঊক ও নসর উল্লিখিত রয়েছে)। আমি তোমাদের জন্য (আমার কথা অমান্য করার অবস্থায়) এক মহা (কঠিন) দিনের শাস্তির আশংকা করি (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন অথবা তূফানের দিন)। তাঁর সম্প্রদায়ের প্রধানরা বলল ঃ আমরা তোমাকে প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে (পতিত) দেখতে পাচ্ছি (যে, তুমি একত্ববাদ শিক্ষা দিচ্ছ এবং শাস্তির ভয় দেখাচ্ছ)। সে (উত্তরে) বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়, আমার মধ্যে মোটেই কোন ভ্রান্তি নেই; কিন্তু (যেহেতু) আমি মহান প্রতিপালকের (প্রেরিত) রসূল—(তিনি আমাকে একত্ববাদ প্রচার করার নির্দেশ দিয়েছেন, তাই স্বীয় কর্তব্য কাজ করি যে,) তোমাদেরকে প্রতিপালকের পয়গাম (ও বিধানাবলী) পৌঁছাই এবং (এ পৌঁছানোর মধ্যে আমার কোন পার্থিব স্বার্থ নেই; শুধু) তোমাদেরই মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করি। (কেননা একত্ববাদে তোমাদেরই মঙ্গল)। আর মহাদিবসের শাস্তির ব্যাপারে তোমরা যে আশ্চর্য বোধ করছ, তা তোমাদের ভ্রান্তি! কেননা, আমি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সেসব বিষয় জানি, যেগুলো তোমরা জান না। (আল্লাহ্ আমাকে বলে দিয়েছেন বিশ্বাস স্থাপন না করলে মহাদিবসের শাস্তি ভোগ করতে হবে)। পক্ষান্তরে (তোমরা যে আমার রিসালতকে এ কারণেই অস্বীকার কর যে, আমি একজন মানুষ; যেমন সূরা মু'মিনুনে বলা হয়েছে ঃ

(তবে) مَا هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيْدُ اَنْ يَّتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَنْزَلَ الخ

তোমরা কি বিস্মিত হচ্ছ যে, তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে তোমাদেরই মধ্য থেকে একজন (মানুষ-এর মাধ্যমে কিছু) উপদেশ এসেছে—(উপদেশ তাই, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ থেকে اِنِّيْٓ اَخَافُ পর্যন্ত)।

যাতে সে তোমাদেরকে (আল্লাহ্র নির্দেশে শাস্তি থেকে) ভয় প্রদর্শন করে এবং যাতে তোমরা (তাঁর ভয় প্রদর্শন হেতু) ভয় কর এবং যাতে (ভয়ের কারণে বিরোধিতা ত্যাগ কর, যদ্দরুন) তোমরা অনুগৃহীত হও। অতঃপর আমি তাঁকে (নূহ্কে) এবং নৌকাস্থিত লোকদেরকে তূফানের শাস্তি থেকে) উদ্ধার করলাম এবং যারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা বলেছিল, তাদেরকে (ঝড়ে) নিমজ্জিত করলাম। নিশ্চয় তারা ছিল অন্ধ সম্প্রদায়। (সত্য-মিথ্যা, লাভ-লোকসান কিছুই তাদের দৃষ্টিগোচর হত না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা আ'রাফের শুরু থেকে এ পর্যন্ত বিভিন্ন শিরোনাম ও যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা ইসলামের মূলনীতি, একত্ববাদ, রিসালত ও পরকাল সপ্রমাণ করা হয়েছে। মানুষকে তার অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে, বিরুদ্ধাচরণের শাস্তি এবং এ প্রসঙ্গে শয়তানের চক্রান্ত ও প্রতারণা ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে। এখন অষ্টম রুকূ থেকে প্রায় সূরার শেষ পর্যন্ত কয়েকজন পয়গম্বর ও তাঁদের উম্মতদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এতে সব পয়গম্বরের সর্বসম্মতভাবে উল্লিখিত মূলনীতি, একত্ববাদ, রিসালত, পরকালের প্রতি নিজ নিজ উম্মতকে আহবান জানানো, মান্যকারীদের প্রতিদান ও পুরস্কার এবং অমান্যকারীদের উপর নানা রকম আযাব ও তাদের অশুভ পরিণাম বিস্তারিতভাবে প্রায় চৌদ্দ রুকূতে বর্ণিত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে শত শত মৌলিক ও শাখাগত মাস'আলাও ব্যক্ত হয়েছে। এভাবে বর্তমান জাতিসমূহকে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের পরিণতি থেকে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়েছে এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জন্য সান্ত্বনা লাভেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী সব পয়গম্বরের সাথেও এমনি ধরনের ব্যবহার হয়ে এসেছে।

আলোচ্য আয়াতসমূহ সূরা আ'রাফের পূর্ণ অষ্টম রুকূ। এতে হযরত নূহ্ (আ) ও তাঁর উম্মতের অবস্থা ও সংলাপের বিবরণ রয়েছে। নবীগণের পরম্পরায় হযরত আদম (আ) যদিও সর্বপ্রথম নবী, কিন্তু তাঁর আমলে ঈমানের সাথে কুফর ও গোমরাহীর মোকাবিলা ছিল না। তাঁর শরীয়তের অধিকাংশ বিধানই পৃথিবী আবাদকরণ ও মানবীয় প্রয়োজনাদির সাথে সম্পৃক্ত ছিল। কুফর ও কাফিরদের কোথাও অস্তিত্ব ছিল না। কুফর ও শিরকের সাথে ঈমানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হযরত নূহ্ (আ)-এর আমল থেকেই শুরু হয়। রিসালত ও শরীয়তের দিক দিয়ে তিনিই জগতের প্রথম রসূল। এছাড়া তুফানে সমগ্র বিশ্ব নিমজ্জিত হওয়ার পর যারা প্রাণে বেঁচেছিল, তারা হযরত নূহ্ (আ) ও তাঁর নৌকাস্থিত সঙ্গী-সাথী ; তাদের দ্বারাই পৃথিবী নতুনভাবে আবাদ হয়। এ কারণেই তাঁকে 'ছোট আদম' বলা হয়। বলা বাহুল্য, এ কারণেই পয়গম্বরদের কাহিনীর সূচনা তাঁর দ্বারাই করা হয়েছে। এ কাহিনীতে সাড়ে নশ' বছরের সুদীর্ঘ জীবনে তাঁর পয়গম্বরসুলভ চেষ্টা-চরিত্র, অধিকাংশ উম্মতের বিরুদ্ধাচরণ এবং এর পরিণতিতে গুটিকতক ঈমানদার ছাড়া অবশিষ্ট সবার প্লাবনে নিমজ্জিত হওয়ার বিষয় বর্ণিত হয়েছে। এর বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে ঃ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ

নূহ্ (আ) হযরত আদম (আ)-এর অষ্টম পুরুষ। মুস্তাদ্‌রাক হাকেমে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, আদম (আ) ও নূহ্ (আ)-এর মাঝখানে দশ শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়েছে। এ বিষয়বস্তুই তিবরানী আবূ যর (রা)-এর বাচনিক রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন।—(তফসীর মাযহারী)

একশ' বছরে এক শতাব্দী হয়। তাই এ রেওয়ায়েত অনুযায়ী তাঁদের উভয়ের মাঝে এক হাজার বছরের ব্যবধান হয়ে যায়। ইবনে জরীর বর্ণনা করেন যে, নূহ্ (আ)-এর

জন্ম হযরত আদম (আ)-এর আটশ' ছাব্বিশ বছর পর হয়েছিল। আর কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর বয়স হয়েছিল নশ' পঞ্চাশ বছর। আদম (আ)-এর বয়স সম্পর্কে এক হাদীসে চল্লিশ কম এক হাজার বছর বলা হয়েছে। এভাবে আদম (আ)-এর জন্ম থেকে নূহ্ (আ)-এর ওফাত পর্যন্ত মোট দু'হাজার আট শ' ছাপ্পান্ন বছর হয়।---(মাযহারী)

নূহ্ (আ)-এর আসল নাম 'শাকের'। কোন কোন রেওয়ায়েতে 'সাকান' এবং কোন কোন রেওয়ায়েতে আবদুল গাফ্ফার বর্ণিত হয়েছে।

এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে যে, তাঁর যুগটি হযরত ইদরিস (আ)-এর পূর্বে ছিল, না পরে? অধিকাংশ সাহাবীর মতে তিনি পূর্বে ছিলেন।---(বাহ্‌রে-মুহীত)

মুস্তাদরাক হাকেমে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ নূহ্ (আ) চল্লিশ বছর বয়সে নবুয়ত প্রাপ্ত হন এবং প্লাবনের পর ষাট বছর জীবিত থাকেন।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নূহ্ (আ) শুধু স্বজাতির জন্যই নবী হিসাবে প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনি সমগ্র বিশ্বের নবী ছিলেন না। তাঁর সম্প্রদায় বর্তমান ইরাকের এলাকায় বসবাস করত এবং বাহ্যত সভ্য হলেও শিরকে লিপ্ত ছিল। তিনি তাদেরকে দাওয়াত দিয়ে একথা বলেন ঃ

يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ

অর্থাৎ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই। আমি তোমাদের জন্য একটি মহাদিবসের শাস্তির আশংকা করি। এর প্রথম বাক্যে আল্লাহ্‌র ইবাদতের প্রতি দাওয়াত রয়েছে। এটাই সব নীতির মূলনীতি। দ্বিতীয় বাক্যে শিরক ও কুফর থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। এটি এ সম্প্রদায়ের মধ্যে মহামারীর আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল। তৃতীয় বাক্যে ঐ মহাশাস্তির আশংকা সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে, যা বিরুদ্ধাচরণের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। এর অর্থ পরকালের মহাশাস্তিও হতে পারে এবং জগতে প্লাবনের শাস্তিও হতে পারে।---(কবীর)

তাঁর সম্প্রদায় উত্তরে বলল ঃ

قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهٖٓ اِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ মলা শব্দের অর্থ সম্প্রদায়ের সর্দার ও সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ। উদ্দেশ্য এই যে, হযরত নূহ্ (আ)-এর দাওয়াতের জবাবে সম্প্রদায়ের প্রধানরা বলল ঃ আমরা মনে করি যে, আপনি প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে পতিত রয়েছেন। কারণ, আপনি আমাদেরকে বাপ-দাদার ধর্ম পরিত্যাগ করতে বলছেন। কিয়ামতে পুনরায় জীবিত হওয়া, প্রতিদান ও শাস্তি ইত্যাদির ধারণা কুসংস্কার বৈ নয়।

এহেন পীড়াদায়ক ও মর্মন্তুদ কথাবার্তার জবাবে নূহ্ (আ) পয়গম্বরসুলভ ভাষায় যা বললেন, তা প্রচারক ও সংস্কারকদের জন্য একটি উজ্জ্বল শিক্ষা ও হিদায়ত। উত্তেজনার স্থলে উত্তেজিত ও ক্রোধান্বিত হওয়ার পরিবর্তে তিনি সরল-সহজ ভাষায় তাদের সন্দেহ নিরসনে প্রবৃত্ত হলেন। বললেন ঃ

يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ-أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ

رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ○

অর্থাৎ হে আমার সম্প্রদায়! আমার মধ্যে কোন পথভ্রষ্টতা নেই। তবে আমি তোমাদের ন্যায় পৈতৃক ধর্মের অনুসারী নই; বরং বিশ্ব-পালকের পক্ষ থেকে প্রেরিত পয়গম্বর। আমি যা কিছু বলি, মহান পালনকর্তার নির্দেশেই বলি এবং আল্লাহ্ তা'আলার পয়গামই তোমাদের কাছে পৌঁছাই। এতে তোমাদেরই মঙ্গল। এতে না আল্লাহ্র কোন লাভ আছে এবং না আমার কোন স্বার্থ আছে। এখানে رَبِّ الْعَالَمِينَ (বিশ্বপালক) শব্দটি শিরকের মূলে কুঠারাঘাত স্বরূপ। এ সম্পর্কে চিন্তা করলে কোন দেবদেবী কিংবা ইয়াযদাঁ ও আহরিমানই টিকতে পারে না। এরপর বলেছেন ঃ কিয়ামতের শাস্তি সম্পর্কে তোমাদের যে সন্দেহ এর কারণ তোমাদের অজ্ঞতা। আমাকে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এ সম্পর্কে নিশ্চিত জ্ঞান দান করা হয়েছে।

এরপর তাদের দ্বিতীয় সন্দেহের উত্তর দেওয়া হয়েছে, যা সূরা মু'মিনুনে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত রয়েছে ঃ

مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ

مَلَائِكَةً -

অর্থাৎ নূহ্ (আ)-এর দাওয়াত শুনে তাঁর কওম এমনও সন্দেহ করল যে, সে তো আমাদেরই মত একজন মানুষ, আমাদেরই মত পানাহার করে এবং নিদ্রিত ও জাগ্রত হয়, তাঁকে আমরা কিরূপে অনুসরণীয় বলে মেনে নিতে পারি! আল্লাহ্ তা'আলা যদি আমাদের কাছে কোন পয়গাম পাঠাতে চাইতেন, তবে ফেরেশতাদের প্রেরণ করতেন। তাদের স্বাতন্ত্র্য ও মাহাত্ম্য আমাদের দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট হত। এখন এছাড়া আর কোন কিছু নয় যে, আমাদের গোত্রেরই এক ব্যক্তি আমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।

এর উত্তরে তিনি বললেন ঃ

أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ

وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ—অর্থাৎ তোমরা কি এ ব্যাপারে বিস্মিত যে, তোমাদের প্রতিপালকের পয়গাম তোমাদেরই মধ্য থেকে একজনের মাধ্যমে তোমাদের কাছে এসেছে, যাতে সে তোমাদের ভীতি প্রদর্শন করে, যাতে তোমরা ভীত হও এবং যাতে তোমরা অনুগৃহীত হও। অর্থাৎ তাঁর ভয় প্রদর্শনের ফলে তোমরা হুঁশিয়ার হয়ে বিরুদ্ধাচরণ ত্যাগ কর, যার ফলে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ নাযিল হয়।

উদ্দেশ্য এই যে, মানুষকে রসূলরূপে মনোনীত করা কোন বিস্ময়কর ব্যাপার নয়। প্রথমত আল্লাহ্ তা'আলা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন। তিনি যাকে ইচ্ছা রিসালত দান করবেন। এতে কারও টুঁ-শব্দটি করার অধিকার নেই। এছাড়া আসল ব্যাপারে চিন্তা করলেও বোঝা যাবে যে, মানুষের প্রতি রিসালতের উদ্দেশ্য মানুষের মাধ্যমেই পূর্ণ হতে পারে। ফেরেশতাদের দ্বারা এ উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে না।

কারণ, রিসালতের আসল লক্ষ্য হচ্ছে মানব জাতিকে আল্লাহ্র আনুগত্য ও ইবাদতে প্রতিষ্ঠিত করা এবং তাঁর নির্দেশাবলীর বিরোধিতা থেকে রক্ষা করা। এটা তখনই সম্ভব, যখন মানুষের মধ্য থেকেই এক ব্যক্তি আদর্শ হয়ে তাদের দেখিয়ে দেয় যে, মানবিক কামনা-বাসনার সাথেও আল্লাহ্র আনুগত্য ও ইবাদত একত্রিত হতে পারে। ফেরেশতা এ দাওয়াত নিয়ে আসলে এবং নিজের দৃষ্টান্ত মানুষের সামনে তুলে ধরলে মানুষের প্রকাশ্য আপত্তি থেকে যেত যে, ফেরেশতারা মানবিক প্রবৃত্তি থেকে মুক্ত—তাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা এবং নিদ্রা ও শ্রান্তি কিছুই নেই—আমরা তাদের মত হব কেমন করে? কিন্তু নিজেদেরই এক ব্যক্তি যখন সব মানবিক প্রবৃত্তি ও বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্র নির্দেশাবলীর পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করবে, তখন তাদের কোন অজুহাত থাকতে পারে না।

এদিকে ইঙ্গিত করার জন্যই বলা হয়েছে ঃ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا অর্থাৎ মানুষ ও মানবিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন কোন ব্যক্তির ভয় প্রদর্শনে প্রভাবান্বিত হয়েই মানুষ ভীত হতে পারে—অন্য কারও ভয় প্রদর্শনে নয়। অধিকাংশ উম্মতের কাফিররা এ সন্দেহ উত্থাপন করেছে যে, কোন মানুষের পক্ষে নবী ও রসূল হওয়া উচিত নয়। কোরআন পাক সবাইকে এ উত্তরই দিয়েছে। পরিতাপের বিষয় যে, কোরআনের এতসব সুস্পষ্ট বর্ণনা সত্ত্বেও আজও কিছু লোককে 'রসূলুল্লাহ্ (সা) মোটেও মানুষ ছিলেন না'—এরূপ একটি অর্থহীন তথ্য প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট দেখা যায়। এরূপ ধারণা যে কোরআনে উল্লিখিত নবী-রসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য ও বর্ণিত বৈশিষ্ট্যের বিপরীত—এ সরল সত্যটুকুও তারা বুঝে না। তারা কোন সমজাতীয় ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকৃতি দিতেও প্রস্তুত নয়। এ কারণেই মূর্খরা সব সময়ই সমসাময়িক ওলী ও আলিমদের প্রতি সমসাময়িকতার কারণেই ঘৃণা ও বিমুখতা পোষণ করে এসেছে।

স্বজাতির দুঃখজনক কথাবার্তার জওয়াবে নূহ্ (আ)-এর দয়ার্দ্র এবং শুভেচ্ছামূলক আচরণও চেতনাহীন জাতির মধ্যে কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করতে পারল না। তারা

অন্ধভাবে মিথ্যারোপেই ব্যাপৃত রইল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি প্লাবনের শাস্তি প্রেরণ করলেন। বলা হয়েছে ঃ

فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ - অর্থাৎ নূহ্ (আ)-এর জালিম সম্প্রদায় তাঁর উপদেশ ও শুভেচ্ছার পরোয়াও করল না এবং যথারীতি মিথ্যারোপে অটল রইল। এর পরিণতিতে আমি নূহ্ (আ) ও তাঁর সঙ্গীদের একটি নৌকায় উঠিয়ে মুক্তি দিয়েছি এবং যারা আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলেছিল, তাদেরকে নিমজ্জিত করে দিয়েছি। নিশ্চয় তারা ছিল এক অন্ধ জনগোষ্ঠী।

হযরত নূহ্ (আ)-এর কাহিনী, তাঁর সম্প্রদায়ের সলিল সমাধি লাভ এবং নৌকা-রোহীদের মুক্তির পূর্ণ বিবরণ সূরা নূহ্ ও সূরা হূদে বর্ণিত হবে। এ স্থলে আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মোটামুটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রা) বলেন ঃ যে সময় নূহ্ (আ)-এর সম্প্রদায়ের উপর প্লাবনের আযাব নেমে এসেছিল, তখন তারা জনসংখ্যা ও শক্তির দিক দিয়ে পরিপূর্ণ ছিল। সংখ্যাধিক্যের কারণে ইরাকের ভূখণ্ড এবং পার্বত্য এলাকায়ও তাদের সংকুলান হচ্ছিল না। আল্লাহ্ তা'আলার চিরন্তন রীতি এই যে, তিনি অবাধ্য জাতিদের অবকাশ দেন। তারা যখন সংখ্যাধিক্য, শক্তি ও ধনাঢ্যতার চরম সীমায় উপনীত হয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, তখনই তাদের উপর আল্লাহ্র আযাব নেমে আসে।—(ইবনে কাসীর)

নূহ্ (আ)-এর সাথে নৌকায় কতজন লোক ছিল, এ সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত রয়েছে। ইবনে কাসীর ইবনে আবি হাতেমের রেওয়ায়তক্রমে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আশিজন লোক ছিল। তন্মধ্যে একজনের নাম ছিল জুরহাম। সে আরবী ভাষায় কথা বলত। —(ইবনে কাসীর)

কোন কোন রেওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে যে, আশি জনের মধ্যে চল্লিশ জন পুরুষ ও চল্লিশ জন মহিলা ছিল। প্লাবনের পর তারা মুসেলের যে স্থানটিতে বসতি স্থাপন করেন, তা 'সামানুন' (অর্থাৎ আশি) নামে খ্যাত হয়ে যায়।

মোট কথা, এখানে নূহ্ (আ)-এর সংক্ষিপ্ত কাহিনী বর্ণনা করে কয়েকটি বিষয় ব্যক্ত করা হয়েছে। এক. পূর্বতন সব পয়গম্বরের দাওয়াত ও বিশ্বাসের মূলনীতি ছিল অভিন্ন। দুই. আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় পয়গম্বরদের সাহায্য ও সমর্থন কিরূপ বিস্ময়কর পন্থায় করেন যে, পাহাড়ের শৃঙ্গ পর্যন্ত সুউচ্চ প্লাবনের মধ্যেও তাঁদের নিরাপত্তা ব্যাহত হয় না। তিন. পয়গম্বরদের প্রতি মিথ্যারোপ করা আল্লাহ্র আযাব ডেকে আনারই নামান্তর। পূর্ববর্তী উম্মতরা যেমন পয়গম্বরদের প্রতি মিথ্যারোপ করার কারণে আযাবে নিপতিত হয়েছে, এ কালের লোকদেরও এ থেকে ভয়মুক্ত হওয়া উচিত নয়।

وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ

مِّنْ إِلٰهٍ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٦٥﴾ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن
قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٦٦﴾
قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ
الْعَالَمِينَ ﴿٦٧﴾ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ﴿٦٨﴾
أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ
لِيُنذِرَكُمْ ۚ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ
وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً ۖ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ﴿٦٩﴾ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا
كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ۖ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ
الصَّادِقِينَ ﴿٧٠﴾ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ ۖ
أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا
نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ ۖ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ
الْمُنتَظِرِينَ ﴿٧١﴾ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا
دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٧٢﴾ ع

(৬৫) 'আদ সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করেছি তাদের ভাই হূদকে। সে বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই ; (৬৬) তার সম্প্রদায়ের সর্দাররা বলল ঃ আমরা তোমাকে নির্বোধ দেখতে পাচ্ছি এবং আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদী মনে করি। (৬৭) সে বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! আমি মোটেই নির্বোধ নই, বরং আমি বিশ্ব-পালকের প্রেরিত পয়গম্বর। (৬৮) তোমাদেরকে পালনকর্তার পয়গাম পৌঁছাই এবং আমি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী, বিশ্বস্ত। (৬৯) তোমরা কি আশ্চর্যবোধ করছ যে, তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের মধ্য থেকেই একজনের বাচনিক উপদেশ এসেছে, যাতে সে তোমাদের ভীতি প্রদর্শন করে।

তোমরা স্মরণ কর, যখন আল্লাহ তোমাদের কওমে-নূহের পর প্রাধান্য দান করেছেন এবং তোমাদের দৈহিক সৌষ্ঠবও বাড়িয়ে দিয়েছেন। তোমরা আল্লাহ্‌র নিয়ামতসমূহ স্মরণ কর—যাতে তোমাদের মঙ্গল হয়। (৭০) তারা বলল ঃ তুমি কি আমাদের কাছে এজন্য এসেছ যে, আমরা এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করি এবং আমাদের বাপ-দাদা যাদের পূজা করত, তাদেরকে ছেড়ে দিই ? অতএব, নিয়ে এস আমাদের কাছে যা দিয়ে আমাদেরকে ভয় দেখাচ্ছ, যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাক। (৭১) সে বলল ঃ অবধারিত হয়ে গেছে তোমাদের উপর তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে শাস্তি ও ক্রোধ। আমার সাথে ঐসব নাম সম্পর্কে কেন তর্ক করছ, যেগুলো তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদারা রেখেছ। আল্লাহ্‌ এ সবের কোন সনদ অবতীর্ণ করেন নি। অতএব অপেক্ষা কর। আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি। (৭২) অনন্তর আমি তাকে ও তার সঙ্গীদের স্বীয় অনুগ্রহে রক্ষা করলাম এবং যারা আমার আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ করত, তাদের মূল কেটে দিলাম। বস্তুত তারা মান্যকারী ছিল না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং আমি 'আদ সম্প্রদায়ের প্রতি তাদের (সমাজের অথবা দেশের) ভাই (হযরত) হূদ (আ)-কে (পয়গম্বর করে) প্রেরণ করেছি। সে (নিজ সম্প্রদায়কে) বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায় ! তোমরা (শুধু) আল্লাহ্‌রই ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত কেউ তোমাদের উপাস্য (হওয়ার যোগ্য) নেই। (মূর্তিপূজা ত্যাগ কর, যেমন পরবর্তী وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا বাক্য থেকে জানা যায়)। অতএব, তোমরা কি (এতবড় অপরাধ অর্থাৎ শিরক করে আল্লাহ্‌র শাস্তিকে) ভয় কর না ? তাঁর সম্প্রদায়ের কাফির-প্রধানরা (উত্তরে) বলল ঃ আমরা তোমাকে নির্বুদ্ধিতায় (পতিত) দেখতে পাচ্ছি (কারণ, তুমি একত্ববাদের শিক্ষা দিচ্ছ এবং শাস্তির ভয় প্রদর্শন করছ)। এবং আমরা নিশ্চয় তোমাকে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত মনে করি। অর্থাৎ (নাউযুবিল্লাহ্‌) একত্ববাদ ও শাস্তির আগমন কোনটিই সত্য নয়। সে বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায় ! আমার মধ্যে সামান্যও নির্বুদ্ধিতা নেই, কিন্তু (যেহেতু) আমি বিশ্ব-পালকের প্রেরিত পয়গম্বর (তিনি আমাকে একত্ববাদ শিক্ষা দিয়েছেন এবং ভয় প্রদর্শনের আদেশ করেছেন, তাই আমি স্বীয় কর্তব্য পালন করছি যে,) তোমাদেরকে পালনকর্তার পয়গাম (এবং নির্দেশাবলী) পৌঁছাই এবং আমি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী, বিশ্বস্ত। (কেননা, একত্ববাদ ও ঈমান তোমাদেরই মঙ্গল।) এবং (তোমরা যে আমার রিসালতকে এ কারণে অস্বীকার করছ যে, আমি একজন মানুষ, যেমন সূরা ইবরাহীমে কওমে-নূহ, 'আদ ও সামূদের কথা উল্লেখ করার পর قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا এবং সূরা ফুস্‌সিলাতে 'আদ ও সামূদের কথা উল্লেখ করার পর قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً الخ বলা হয়েছে, তবে) তোমরা কি বিস্মিত হচ্ছ যে, তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে তোমাদেরই মধ্য থেকে একজন (মানুষ)-এর মাধ্যমে কিছু উপদেশ এসেছে—(উপদেশ তাই, যা পূর্বে উল্লেখ করা

হয়েছে ঃ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ থেকে أَفَلَا تَتَّقُونَ পর্যন্ত—) যাতে সে তোমাদের (আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে) ভয় প্রদর্শন করে? (অর্থাৎ এটা কোন বিস্ময়ের কথা নয়। মানুষ হওয়া নবুয়তের পরিপন্থী নয়। পূর্বোল্লিখিত أَفَلَا تَتَّقُونَ বাক্যে ভীতি প্রদর্শন ছিল। এখন উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে—) এবং (হে আমার সম্প্রদায়) তোমরা স্মরণ কর, (স্মরণ করে অনুগ্রহ স্বীকার এবং আনুগত্য কর)। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে নূহের সম্প্রদায়ের পর (ভূপৃষ্ঠে) আবাদ করেছেন এবং আকার-আকৃতিতে তোমাদেরকে বিশালতা (ও) আধিক্য দিয়েছেন। অতএব, আল্লাহ্ তা'আলার (এ) নিয়ামতসমূহকে স্মরণ কর (এবং স্মরণ করে অনুগ্রহ স্বীকার কর এবং আনুগত্য কর) যাতে তোমরা (সর্বপ্রকার) সুফল প্রাপ্ত হও। তারা বলল ঃ (চমৎকার!) তুমি কি আমাদের কাছে এজন্য এসেছ যে, আমরা একমাত্র আল্লাহ্‌রই ইবাদত করি এবং আমাদের বাপদাদা যাদের (অর্থাৎ যে দেবদেবীর) পূজা (-অর্চনা) করত আমরা তাদের (ইবাদত) ছেড়ে দিই? (অর্থাৎ আমরা এরূপ করব না)। অতএব, আমাদের (অমান্য করার কারণে) যে শাস্তির ভয় দেখাচ্ছ, (যেমন أَفَلَا تَتَّقُونَ থেকে বোঝা যায়) তা (অর্থাৎ সে শাস্তি) আমাদের কাছে নিয়ে আস—যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাক। সে বলল ঃ (তোমরা যখন এমনি অবাধ্য,) সুতরাং এখন তোমাদের উপর পালনকর্তার পক্ষ থেকে শাস্তি ও ক্রোধ এলো বলে! (অতএব শাস্তি সম্পর্কিত সন্দেহের জবাব তখনই পেয়ে যাবে। এছাড়া একত্ববাদ সম্পর্কে তোমাদের সন্দেহ আছে। তোমরা ঐসব প্রতিমাকে উপাস্য বলে থাক, যাদের নাম তোমরা উপাস্য রেখেছ ঃ কিন্তু বাস্তবে এসবের উপাস্য হওয়ার কোন প্রমাণ নেই। অতএব) তোমরা কি আমার সাথে এমন (ভিত্তিহীন) নাম সম্পর্কে বিতর্ক করছ, (অর্থাৎ ঐ নামধারীরা কতিপয় নামের পর্যায়ভুক্ত) যাদেরকে তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা (নিজেরাই) নামকরণ করেছে, (কিন্তু) এগুলির উপাস্য হওয়ার (যুক্তিগত কিংবা ইতিহাসগত) কোন প্রমাণ আল্লাহ্ তা'আলা প্রেরণ করেন নি। (অর্থাৎ বিতর্কে প্রমাণ পেশ করা এবং প্রতিপক্ষের প্রমাণ নাকচ করা বাদীর দায়িত্ব। তোমরা প্রমাণও পেশ করতে পার না এবং আমার প্রমাণের উত্তরও দিতে পার না। এমতাবস্থায় বিতর্ক কিসের)? অতএব, তোমরা (এখন বিতর্ক খতম কর এবং আল্লাহ্‌র শাস্তির জন্য) প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি। অনন্তর (শাস্তি এল এবং) আমি তাঁকে ও তাঁর সঙ্গীদের (অর্থাৎ মু'মিনদের স্বীয় অনুগ্রহে এ শাস্তি থেকে) উদ্ধার করলাম এবং তাদের মূল কেটে দিলাম (অর্থাৎ সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিলাম,) যারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা বলেছিল এবং তারা (চরম পাষণ্ড হওয়ার কারণে) বিশ্বাস স্থাপনকারী ছিল না। (অর্থাৎ ধ্বংসপ্রাপ্ত না হলেও বিশ্বাস স্থাপন করত না। তাই আমি সে সময়কার উপযোগিতা অনসারে তাদেরকে ধ্বংসই করে দিয়েছি)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

'আদ ও সামূদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ঃ 'আদ' প্রকৃতপক্ষে নূহ্ (আ)-এর পঞ্চম পুরুষের

মধ্যে এবং তাঁর পুত্র সামের বংশধরেরই এক ব্যক্তির নাম। অতঃপর তাঁর বংশধর ও গোটা সম্প্রদায় 'আদ' নামে খ্যাত হয়ে গেছে। কোরআন পাকে 'আদের সাথে কোথাও 'আদে-উলা' (প্রথম 'আদ) এবং কোথাও إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, 'আদ সম্প্রদায়কে 'ইরাম'ও বলা হয় এবং প্রথম 'আদের বিপরীতে কোন দ্বিতীয় 'আদও রয়েছে ; এ সম্পর্কে তফসীরবিদ ও ইতিহাসবেত্তাদের উক্তি বিভিন্ন রূপ। অধিক প্রসিদ্ধ উক্তি এই যে, 'আদের দাদার নাম ইরাম। তার এক পুত্র আওসের বংশধররাই 'আদ। তাদেরকে প্রথম 'আদ বলা হয়। অপর পুত্র জাসুর পুত্র হচ্ছে 'সামূদ'। তার বংশধরকে দ্বিতীয় 'আদ' বলা হয়। এ বক্তব্যের সারমর্ম এই যে, 'আদ' ও 'সামূদ' উভয়ই ইরামের দু'শাখা। এক শাখাকে প্রথম 'আদ' এবং অপর শাখাকে 'সামূদ' অথবা দ্বিতীয় 'আদ' বলা হয়। ইরাম শব্দটি 'আদ ও সামূদ উভয়ের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য।

'আদ সম্প্রদায়ের তেরটি বংশ-শাখা ছিল। আম্মান থেকে শুরু করে হাযরামাউত ও ইয়ামন পর্যন্ত তাদের বসতি ছিল। তাদের খেত-খামারগুলো অত্যন্ত সজীব ও শস্যশ্যামল ছিল। সব রকম বাগান ছিল। তারা ছিল সুঠামদেহী ও বিরাট বপু বিশিষ্ট। আয়াতে زَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً বাক্যের মর্ম তাই। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সামনে দুনিয়ার যাবতীয় নিয়ামতের দ্বার খুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু বক্রবুদ্ধির কারণে এসব নিয়ামতই তাদের জন্য কাল হয়ে দাঁড়াল। তারা শক্তিমদমত্ত হয়ে مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً (আমাদের চাইতে শক্তিশালী কে)? এ ধরনের ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করতে থাকে।

যে বিশ্ব-পালকের নিয়ামতের বৃষ্টি তাদের উপর বর্ষিত হচ্ছিল তারা তাঁকে পরিত্যাগ করে মূর্তিপূজায় আত্মনিয়োগ করে।

কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ 'আদ সম্প্রদায়ের উপর যখন আযাব আসে, তখন তাদের একটি প্রতিনিধিদল মক্কা গমন করেছিল। ফলে তারা আযাব থেকে রক্ষা পেয়ে যায় —তাদেরকে দ্বিতীয় 'আদ' বলা হয়।---(বয়ানুল কোরআন)

'হূদ' একজন পয়গম্বরের নাম। তিনিও নূহ্ (আ)-এর পঞ্চম পুরুষের মধ্যে এবং সামের বংশধরের এক ব্যক্তি। 'আদ' সম্প্রদায় এবং 'হূদ' (আ)-এর বংশ-তালিকা চতুর্থ পুরুষে সাম পর্যন্ত পৌঁছে এক হয়ে যায়।---তাই হূদ (আ) তাদের বংশগত ভাই। এ কারণেই আয়াতে أَخَاهُمْ هُودًا (তাদের ভাই হূদ) বলা হয়েছে।

হযরত হূদ (আ)-এর বংশ তালিকা ও আংশিক জীবন চরিত ঃ আল্লাহ্ তা'আলাই তাদের হিদায়তের জন্য হূদ (আ)-কে পয়গম্বররূপে প্রেরণ করেন। তিনি ছিলেন তাদেরই পরিবারের একজন। আরব বংশ-বিশেষজ্ঞ আবুল বারাকাত জওফী লেখেন ঃ হূদ (আ)-এর পুত্র ইয়ারাব ইবনে কাহ্তান ইয়ামনে পৌঁছে বসতি স্থাপন করে। ইয়ামনের সব সম্প্রদায়

তাঁরই বংশধর। আরবী ভাষার সূচনা তার থেকে হয়েছে এবং তার নামানুসারে ভাষার নাম আরবী এবং এ ভাষাভাষীদের নাম হয়েছে আরব।—(বাহ্‌রে মুহীত)

কিন্তু বিশুদ্ধ তথ্য এই যে, আরবী ভাষা নূহ (আ)-র আমল থেকেই প্রচলিত ছিল। নূহ্ (আ)-র নৌকার একজন আরোহী জুরহাম আরবী ভাষায় কথা বলতেন।—(বাহ্‌রে মুহীত)। জুরহাম থেকেই মক্কা শহর আবাদ হয়েছে। এটা সম্ভব যে, ইয়ামনে আরবী ভাষার সূচনা ইয়ারাব ইবনে কাহ্‌তান থেকে হয়েছিল। আবুল বারাকাতের বক্তব্যের উদ্দেশ্যও হয়ত তাই।

হযরত হূদ (আ) 'আদ জাতিকে মূর্তিপূজা ত্যাগ করে একত্ববাদের অনুসরণ করতে এবং অত্যাচার-উৎপীড়ন ত্যাগ করে ন্যায় ও সুবিচারের পথ ধরতে আদেশ করেন। কিন্তু তারা স্বীয় ধনৈশ্বর্যের মোহে মত্ত হয়ে তাঁর আদেশ অমান্য করে। এর পরিণতিতে তাদের উপর প্রথম আযাব নাযিল হয় এবং তিন বছর পর্যন্ত উপর্যুপরি বৃষ্টি বন্ধ থাকে। তাদের শস্যক্ষেত্র শুষ্ক বালুকাময় মরুভূমিতে পরিণত হয়ে যায়। বাগান জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা শিরক ও মূর্তিপূজা ত্যাগ করে না। অতঃপর আট দিন সাত রাত্রি পর্যন্ত তাদের উপর ঘূর্ণিঝড়ের আযাব আপতিত হয়। ফলে তাদের অবশিষ্ট বাগবাগিচা ও দালান-কোঠা ভূমিসাৎ হয়ে যায়। মানুষ ও জীবজন্তু শূন্যে উড়তে থাকে। অতঃপর মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়তে থাকে। এভাবে 'আদ জাতিকে সমূলে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। আলোচ্য আয়াতসমূহে বলা হয়েছে ঃ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا—অর্থাৎ আমি মিথ্যারোপ-কারীদের বংশ কেটে দিয়েছি। এর মর্ম কোন কোন তফসীরকার এটাই স্থির করেছেন যে, তখন 'আদের মধ্যে যারা জীবিত ছিল, তাদের সবাইকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। কেউ কেউ এর অর্থ এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, ভবিষ্যতের জন্যও 'আদ জাতিকে নির্বংশ করে দেওয়া হয়েছে।

হযরত হূদ (আ)-এর আদেশ অমান্য করা এবং কুফর ও শিরকে লিপ্ত থাকার কারণে যখন 'আদ জাতির উপর আযাব নাযিল হয়, তখন হূদ (আ) ও তাঁর সঙ্গীরা একটি কুঁড়েঘরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। আশ্চর্যের বিষয় ছিল এই যে, ঘূর্ণিঝড়ের দাপটে বিরাট বিরাট অট্টালিকা মাটিতে লুটিয়ে পড়লেও এ কুঁড়েঘরটিতে বাতাস খুব সমম পরিমাণে প্রবেশ করত। হযরত হূদ (আ) ও তাঁর সঙ্গীরা ঠিক আযাবের মুহূর্তেও এখানে নিশ্চিন্তে বসে রইলেন। তাঁদের কোন কষ্ট হয়নি। সবাই ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর তিনি মক্কায় চলে যান এবং সেখানেই ওফাত পান।—(বাহ্‌রে মুহীত)

'আদ জাতির উপর ঘূর্ণিঝড়ের আকারে আযাব আসা কোরআন পাকে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত রয়েছে। সূরা মু'মিনুনে নূহ্ (আ)-এর কাহিনী উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে ঃ ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ অর্থাৎ অতঃপর আমি তাদের পরে আরও একটি সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছি। বাহ্যত এরাই হচ্ছে 'আদ জাতি। পরে এ সম্প্রদায়ের আচার-

আচরণ ও বাক্যালাপ বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ—অর্থাৎ একটি বিকট শব্দ তাদেরকে সঠিকভাবে আচ্ছন্ন করল। এ আয়াতের ভিত্তিতে কোন কোন তফসীরবিদ বলেনঃ 'আদ জাতির উপর বিকট ধরনের শব্দের আযাব আপতিত হয়েছিল। কিন্তু উভয় মতের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। এটা সম্ভব যে, বিকট শব্দ ও ঘূর্ণিঝড় দুটিই হয়েছিল।

এ হচ্ছে 'আদ জাতি ও হযরত হুদ (আ)-এর সংক্ষিপ্ত ঘটনা। কোরআন পাকের ভাষায় এর বিবরণ এরূপঃ

প্রথম আয়াত وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ অর্থাৎ আমি 'আদ জাতির প্রতি তাদের ভাই হুদ (আ)-কে হিদায়তের জন্য প্রেরণ করেছি। সে বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা শুধু আল্লাহ্ তা'আলারই ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই। তোমরা কি ভয় কর না?

'আদ জাতির পূর্বে নূহ্ (আ)-এর সম্প্রদায়ের উপর পতিত মহাশাস্তির স্মৃতি তখনও মানুষের মন থেকে মুছে যায়নি। তাই হুদ (আ) আযাবের কঠোরতা বর্ণনা করা প্রয়োজন মনে করেন নি; বরং এতটুকু বলাই যথেষ্ট মনে করেছেন যে, তোমরা কি ভয় কর না?

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছেঃ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ অর্থাৎ সম্প্রদায়ের প্রধানরা বলল ঃ আমরা তোমাকে নির্বুদ্ধিতায় লিপ্ত দেখতে পাচ্ছি। আমাদের ধারণা, তুমি একজন মিথ্যাবাদী।

কথাগুলি ছিল প্রায় নূহ্ (আ)-এর সম্প্রদায়ের প্রত্যুত্তরের মতই---শুধু কয়েকটি শব্দের পার্থক্য মাত্র। তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াতে এর উত্তরও প্রায় তেমনি দেওয়া হয়েছে, যেমন নূহ্ (আ) দিয়েছিলেন। অর্থাৎ আমার মধ্যে কোন নির্বুদ্ধিতা নেই। ব্যাপার শুধু এতটুকু যে, আমি বিশ্বপালকের কাছ থেকে রসূল হয়ে এসেছি। তাঁর বার্তা তোমাদের কাছে পৌঁছাই। আমি সুস্পষ্টভাবে তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী। তাই তোমাদের পৈতৃক মূর্খতায় তোমাদের সঙ্গী হওয়ার পরিবর্তে তোমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সত্য কথা তোমাদের কাছে পৌঁছে দিই। কিন্তু তা তোমাদের মনঃপূত নয়।

পঞ্চম আয়াতে 'আদ জাতির সে আপত্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা তাদের পূর্বে নূহ্ (আ)-এর সম্প্রদায় উত্থাপন করেছিল অর্থাৎ আমরা নিজেদেরই মত কোন মানুষকে নেতারূপে কিভাবে মেনে নিতে পারি; কোন ফেরেশতা হলে মেনে নেওয়া সম্ভবপর ছিল।

এর উত্তরও কোরআন পাক তাই উল্লেখ করেছে, যা নূহ (আ) দিয়েছিলেন। অর্থাৎ এটা আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, কোন মানুষ আল্লাহ্‌র রসূল হয়ে মানুষকে ভয় প্রদর্শনের জন্য আসবেন। কেননা মানুষকে বোঝানোর জন্য মানুষের পয়গম্বর হওয়াই কার্যকরী হতে পারে।

এরপর 'আদ জাতিকে আল্লাহ্‌ প্রদত্ত নিয়ামতসমূহ স্মরণ করিয়ে বলা হয়েছে ঃ

وَاذْكُرُوْٓا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّزَادَكُمْ فِى الْخَلْقِ بَصْۜطَةً

فَاذْكُرُوْٓا اٰلَآءَ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

অর্থাৎ স্মরণ কর যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের কওমে নূহের পর ভূপৃষ্ঠের মালিক করে দিয়েছেন এবং দেহাবয়বে বিশালতা ও সংখ্যায় আধিক্য দিয়েছেন। আল্লাহ্‌র এসব নিয়ামত স্মরণ করলে তোমাদের মঙ্গল হবে।

কিন্তু এ অবাধ্য জাতি এসব উপদেশের প্রতি কর্ণপাত করল না। তারা পথভ্রষ্টদের চিরাচরিত প্রথায় উত্তর দিল ঃ তুমি কি আমাদের বাপ-দাদাদের ধর্ম আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে চাও? দেবতাদের ছেড়ে আমরা এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করি--এটাই কি তোমার কাম্য? না আমরা তা করতে পারব না। তুমি যে শাস্তির ভয় দেখাচ্ছ তা নিয়ে এস, যদি সত্যবাদী হও।

ষষ্ঠ আয়াতে হুদ (আ) উত্তর দিয়েছেন ঃ তোমরা যখন এমনি অবাধ্য ও অজ্ঞান, তখন তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র গযব ও শাস্তি এল বলে। তোমরা অপেক্ষা কর। আমিও এখন তারই প্রতীক্ষা করছি। জাতির এ উষ্কানিমূলক উত্তর শুনেও তিনি আযাব আসার সংবাদ দিয়েছিলেন বটে; কিন্তু পয়গম্বরসুলভ দয়া ও শুভেচ্ছা তাঁকে সাথে সাথে একথা বলতেও বাধ্য করল ঃ পরিতাপের বিষয়, তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা জড় ও অচেতন পদার্থসমূহকে উপাস্য করে নিয়েছ। এদের উপাস্য হওয়ার না কোন যুক্তিগত প্রমাণ আছে, না ইতিহাসগত। এদের ইবাদতে তোমরা এতই পাকা হয়ে গেছ যে, এদের সমর্থনে আমার সাথে বিতর্ক করে যাচ্ছ!

সর্বশেষ আয়াতে বলা হয়েছে, হুদ (আ)-এর প্রচেষ্টা এবং 'আদ জাতির অবাধ্যতার সর্বশেষ পরিণতি এই দাঁড়ায় যে, আমি হুদ ও তাঁর সাথী মু'মিনদের আযাব থেকে নিরাপদে রেখেছি এবং মিথ্যারোপকারীদের মূল কেটে দিয়েছি। তারা বিশ্বাস স্থাপনকারী ছিল না।

এ কাহিনীতে গাফিলদের জন্য আল্লাহ্‌র স্মরণ ও আনুগত্যে আত্মনিয়োগ করার নির্দেশ, বিরুদ্ধাচরণকারীদের জন্য শিক্ষার সামগ্রী এবং প্রচারক ও সংস্কারকদের জন্য পয়গম্বরসুলভ প্রচার ও সংস্কার পদ্ধতির শিক্ষা বিদ্যমান রয়েছে।

وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا ۘ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ

مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۭ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۭ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ
لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْٓ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ
فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝ وَاذْكُرُوْٓا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ
عَادٍ وَّبَوَّاَكُمْ فِي الْاَرْضِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْ سُهُوْلِهَا قُصُوْرًا
وَّتَنْحِتُوْنَ الْجِبَالَ بُيُوْتًا ۚ فَاذْكُرُوْٓا اٰلَآءَ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْاَرْضِ
مُفْسِدِيْنَ ۝ قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لِلَّذِيْنَ
اسْتُضْعِفُوْا لِمَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ صٰلِحًا مُّرْسَلٌ
مِّنْ رَّبِّهٖ ۭ قَالُوْٓا اِنَّا بِمَآ اُرْسِلَ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ۝ قَالَ الَّذِيْنَ
اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا بِالَّذِيْٓ اٰمَنْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ۝

(৭৩) সামুদ সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছি তাদের ভাই সালেহ্‌কে। সে বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে একটি প্রমাণ এসে গেছে। এটি আল্লাহ্‌র উষ্ট্রী—তোমাদের জন্য প্রমাণ। অতএব একে ছেড়ে দাও, আল্লাহ্‌র ভূমিতে চরে বেড়াবে। একে অসৎভাবে স্পর্শ করবে না। অন্যথায় তোমাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি এসে স্পর্শ করবে। (৭৪) তোমরা স্মরণ কর, যখন তোমাদের 'আদ জাতির পরে সর্দার করেছেন ঃ তোমাদের পৃথিবীতে ঠিকানা দিয়েছেন। তোমরা নরম মাটিতে অট্টালিকা নির্মাণ কর এবং পর্বতগাত্র খনন করে প্রকোষ্ঠ নির্মাণ কর। অতএব, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করো না। (৭৫) তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক সর্দারেরা ঈমানদার দরিদ্রদের জিজ্ঞেস করল ঃ তোমরা কি বিশ্বাস কর যে, সালেহ্‌কে তার পালনকর্তা প্রেরণ করেছেন? তারা বলল ঃ আমরা তো তাঁর আনীত বিষয়ের প্রতি বিশ্বাসী। (৭৬) দাম্ভিক-করা বলল ঃ তোমরা যে বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করেছ, আমরা তা অস্বীকার করি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর আমি সামুদ জাতির প্রতি তাদের ভাই সালেহ্ (আ)-কে (পয়গম্বর করে) প্রেরণ করেছি। সে (স্বজাতিকে) বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা (শুধু) আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের উপাস্য হওয়ার যোগ্য কেউ নেই।

(তারা একটি বিশেষ মো'জেযা চেয়ে বলল ঃ এ প্রস্তরখণ্ড থেকে একটি উষ্ট্রী পয়দা হলে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করব। তাঁর দোয়ায় তাই হলো। একটি প্রস্তরখণ্ড বিস্ফারিত হয়ে তার ভেতর থেকে একটি বৃহদাকার উষ্ট্রী বের হয়ে এল। বিষয়টি মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণিত)। সে বলল ঃ তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে আমার রসূল হওয়ার একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ এসে গেছে। (অতঃপর তা বর্ণনা করে বলা হচ্ছে,) এটি হল আল্লাহ্‌র উষ্ট্রী, যা তোমাদের জন্য প্রমাণ (হিসাবে প্রকাশ করা হয়েছে। এজন্যই আল্লাহ্‌র উষ্ট্রী বলে অভিহিত হয়েছে। কেননা, এটি আল্লাহ্‌র প্রমাণ)। অতএব (আমার রিসালতের প্রমাণ হওয়া ছাড়াও স্বয়ং এরও কিছু অধিকার রয়েছে। সেগুলো এই যে,) একে ছেড়ে দাও আল্লাহ্‌র ভূমিতে (ঘাস-পানি) খেয়ে ফিরবে। (নিজ পালার দিন পানি পান করবে। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে।) এবং একে অসৎ-ভাবে (কষ্টদানের ইচ্ছায়) স্পর্শ করবে না—অন্যথায় তোমাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পাকড়াও করবে এবং (হে আমার সম্প্রদায়) তোমরা স্মরণ কর, (এবং স্মরণ করে অনুগ্রহ স্বীকার কর এবং আনুগত্য কর)। তিনি তোমাদের 'আদ জাতির পরে (ভূপৃষ্ঠে) আবাদ করেছেন এবং তোমাদের পৃথিবীতে বসবাসের (মনমত) ঠিকানা দিয়েছেন। তোমরা নরম মাটিতে (বৃহদাকার) অট্টালিকা নির্মাণ কর এবং পর্বতগাত্র খোদাই করে তাতে (-ও) প্রকোষ্ঠ নির্মাণ কর। অতএব, আল্লাহ্ তা'আলার (এসব) নিয়ামত (এবং অন্যান্য নিয়ামতও) স্মরণ কর। (এবং কুফর ও শিরকের মাধ্যমে) পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করো না। (অর্থাৎ বিশ্বাস স্থাপন কর। কিন্তু এত উপদেশ সত্ত্বেও মাত্র কয়েকজন দরিদ্র লোক বিশ্বাস স্থাপন করল। অতঃপর তাদের ও বড়লোকদের মধ্যে এরূপ কথাবার্তা হল, অর্থাৎ) তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক প্রধানরা ঈমানদার দরিদ্রদের জিজ্ঞেস করল ঃ তোমরা কি এ কথায় বিশ্বাস স্থাপন কর যে, সালেহ (আ) স্বীয় পালনকর্তার পক্ষ থেকে (পয়গম্বররূপে) প্রেরিত (হয়ে এসেছেন)? তারা (উত্তরে) বলল ঃ নিশ্চয়, আমরা সে বিষয়ে (অর্থাৎ সে নির্দেশের) প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস করি, যা দিয়ে তাঁকে প্রেরণ করা হয়েছে। দাম্ভিকরা বলল ঃ তোমরা যে বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করেছ, আমরা তা অস্বীকার করি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত সালেহ্ (আ) ও তাঁর সম্প্রদায়ের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। যেমন, ইতিপূর্বে কওমে নূহ্ ও কওমে হুদের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। সূরা আ'রাফের শেষ পর্যন্ত পূর্ববর্তী পয়গম্বর ও তাঁদের উম্মতের অবস্থা এবং সত্যের প্রতি দাওয়াত দেওয়ার কারণে তাদের কুফর ও অশুভ পরিণতির বিষয় বর্ণিত হবে।

আলোচ্য প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে ঃ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا

ইতিপূর্বে 'আদ জাতির আলোচনায় বলা হয়েছে যে, 'আদ ও সামূদ একই দাদার বংশ-ধরের দু'ব্যক্তির নাম। তাদের সন্তানরাও তাদের নামে অভিহিত হয়ে দু'সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। একটি 'আদ সম্প্রদায়, আর একটি সামূদ সম্প্রদায়। তারা আরবের উত্তর

পশ্চিম এলাকায় বসবাস করত। তাদের প্রধান শহরের নাম ছিল 'হজর'। বর্তমানে একে সাধারণত 'মাদায়েনে সালেহ্' বলা হয়। 'আদ' জাতির মত সামূদ জাতিও সম্পন্ন, শক্তিশালী ও বীর জাতি ছিল। তারা প্রস্তর খোদাই ও স্থাপত্য বিদ্যায় খুবই পারদর্শী ছিল। সমতল ভূমিতে বিশাল এলাকায় অট্টালিকা নির্মাণ ছাড়াও পর্বত খোদাই করে নানা রকম প্রকোষ্ঠ নির্মাণ করত। 'আরদুল-কোরআন' গ্রন্থে মাওলানা সাইয়্যেদ সোলায়মান লিখেছেন ঃ তাদের স্থাপত্যের নিদর্শনাবলী আজও পর্যন্ত বিদ্যমান রয়েছে। এগুলোর গায়ে ইরামী ও সামূদী বর্ণমালায় শিলালিপি খোদিত রয়েছে।

পার্থিব বিত্ত ও ধনৈশ্বর্যের পরিণতি প্রায়ই অশুভ হয়ে থাকে। বিত্তশালীরা আল্লাহ্ ও পরকাল ভুলে গিয়ে ভ্রান্ত পথে পা বাড়ায়। সামূদ জাতির বেলায়ও তাই হয়েছে।

অথচ পূর্ববর্তী কওমে নূহের শাস্তির ঘটনাবলী তখনও লোকমুখে আলোচিত হত। এবং 'আদ জাতির ধ্বংসের কাহিনী যেন সাম্প্রতিককালের ঘটনা বলে বিবেচিত হত। কিন্তু ঐশ্বর্য ও শক্তির নেশা এমনি জিনিস যে, একজনের ধ্বংসস্তূপের উপর অন্যজন এসে স্বীয় প্রাসাদ নির্মাণ করে এবং প্রথমজনের ইতিবৃত্ত সম্পূর্ণ ভুলে যায়। 'আদ জাতির ধ্বংসের পর সামূদ জাতি তাদের পরিত্যক্ত ঘরবাড়ী ও সহায়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় এবং যেসব জায়গায় নিজেদের বিলাসবহুল প্রাসাদ গড়ে তোলে, সেখানেই যে তাদের ভাইয়েরা নিশ্চিহ্ন হয়েছিল তা বেমালুম ভুলে যায়। তারা 'আদ জাতির অনুরূপ কার্যকলাপও শুরু করে দেয়। আল্লাহ্ ও পরকাল বিস্মৃত হয়ে শিরক ও মূর্তিপূজায় লিপ্ত হয়ে পড়ে। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় চিরন্তন রীতি অনুযায়ী তাদের হিদায়তের জন্য সালেহ্ (আ)-কে পয়গম্বর রূপে প্রেরণ করেন। তিনি বংশ ও দেশের দিক দিয়ে সামূদ জাতিরই একজন এবং সামেরই বংশধর ছিলেন। এ কারণেই আয়াতে তাঁকে أَخَاهُمْ صَالِحًا অর্থাৎ সামূদ জাতির ভাই বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সালেহ্ (আ) স্বীয় সম্প্রদায়কে সে দাওয়াতই দেন, যা হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে তখনও পর্যন্ত সমস্ত পয়গম্বর নিয়ে এসেছিলেন। যেমন, কোরআনে বলা হয়েছে ঃ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ —অর্থাৎ আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রসূল প্রেরণ করেছি, যাতে তারা মানুষকে আল্লাহ্র ইবাদত করার ও মূর্তিপূজা পরিহার করার নির্দেশ দেয়। পূর্ববর্তী পয়গম্বরদের ন্যায় সালেহ্ (আ)-ও তাঁর জাতিকে একথাই বললেন যে, আল্লাহ্ তা'আলাকে প্রতিপালক ও স্রষ্টা মনে কর। তিনি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই। তাঁর ভাষায় ঃ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ এতদসঙ্গে আরও বললেন ঃ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ —অর্থাৎ

এখন তো একটি সুস্পষ্ট নিদর্শনও প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এসে গেছে। এ নিদর্শনের অর্থ একটি আশ্চর্য ধরনের উষ্ট্রী। এ আয়াতেও এর সংক্ষিপ্ত উল্লেখ রয়েছে এবং কোরআনের বিভিন্ন সূরায় এর বিস্তারিত বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে। এ উষ্ট্রীর ঘটনা এই যে, হযরত সালেহ্ (আ) যৌবনকাল থেকেই স্বীয় সম্প্রদায়কে একত্ববাদের দাওয়াত দিতে শুরু করেন এবং এ কাজ করতে করতেই বার্ধক্যের দ্বারে উপনীত হন। তাঁর বারবার পীড়াপীড়িতে অতিষ্ঠ হয়ে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা স্থির করল যে, তাঁর কাছে এমন একটি দাবী করতে হবে, যা পূরণ করতে তিনি অক্ষম হয়ে পড়বেন এবং আমরা তাঁকে স্তব্ধ করে দিতে পারব। সেমতে তারা দাবী করল যে, আপনি যদি বাস্তবিকই আল্লাহ্র পয়গম্বর হন, তবে আমাদেরকে 'কাতেবা' পাহাড়ের ভেতর থেকে একটি দশ মাসের গর্ভবতী, সবল ও স্বাস্থ্যবতী উষ্ট্রী বের করে দেখান।

সালেহ্ (আ) প্রথমে তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলেন যে, যদি আমি তোমাদের দাবী পূরণ করে দিই, তবে তোমরা আমার প্রতি ও আমার দাওয়াতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে কি না? সবাই যখন এই মর্মে অঙ্গীকার করল, তখন সালেহ্ (আ) প্রথমে দু'রাকআত নামায পড়ে আল্লাহ্র কাছে দোয়া করলেন, "ইয়া পরওয়ারদেগার! আপনার জন্য কোন কাজই কঠিন নয়। তাদের দাবী পূরণ করে দিন।" দোয়ার সাথে সাথে পাহাড়ের গায়ে স্পন্দন দেখা গেল এবং একটি বিরাট প্রস্তরখণ্ড বিস্ফারিত হয়ে তার ভেতর থেকে দাবীর অনুরূপ একটি উষ্ট্রী বের হয়ে এল।

সালেহ্ (আ)-এর এ বিস্ময়কর মো'জেযা দেখে কিছু লোক তৎক্ষণাৎ মুসলমান হয়ে গেল এবং অবশিষ্টরাও মুসলমান হওয়ার ইচ্ছা করল, কিন্তু দেবদেবীদের বিশেষ পূজারী ও মূর্তিপূজার ঠাকুর ধরনের কিছু সর্দার তাদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধা দিল। হযরত সালেহ্ (আ) স্বীয় সম্প্রদায়কে অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে দেখে শংকিত হলেন যে, এদের উপর আযাব এসে যেতে পারে। তাই পয়গম্বরসুলভ দয়া প্রকাশ করে বললেনঃ এ উষ্ট্রীর দেখাশোনা কর। একে কোনরূপ কষ্ট দিও না। এভাবে হয়ত তোমরা আযাব থেকে বেঁচে যেতে পার। এর অন্যথা হলে তোমরা সাথে সাথে আযাবে পতিত হবে। নিম্নোক্ত আয়াতে এ কথাই ব্যক্ত হয়েছেঃ

هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْٓ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ —অর্থাৎ এটি আল্লাহ্র উষ্ট্রী—তোমাদের জন্য নিদর্শন। অতএব, একে আল্লাহ্র যমীনে চরে বেড়াতে দাও এবং একে অনিষ্টের অভিপ্রায়ে স্পর্শ করো না; নতুবা তোমাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পাকড়াও করবে। এ উষ্ট্রীকে 'আল্লাহ্র উষ্ট্রী' বলার কারণ এই যে, এটি আল্লাহ্র অসীম শক্তির নিদর্শন এবং সালেহ্ (আ)-এর মো'জেযা হিসাবে বিস্ময়কর পন্থায় সৃষ্টি হয়েছিল। যেমন, হযরত ঈসা (আ)-র জন্মও অলৌকিক পন্থায় হয়েছিল বলে তাঁকে রূহুল্লাহ্ (আল্লাহ্র আত্মা) বলা হয়েছে।

تَاْكُلْ فِىْ اَرْضِ اللّٰهِ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ উষ্ট্রীর পানাহারে তোমাদের মালিকানা ও তোমাদের ঘর থেকে কিছুই ব্যয় হয় না। যমীন আল্লাহ্‌র এবং এর উৎপন্ন ফসলও আল্লাহ্‌র সৃজিত। কাজেই তাঁর উষ্ট্রীকে তাঁর যমীনে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দাও যাতে সাধারণভাবে চারণক্ষেত্রে বিচরণ করে বেড়াতে পারে।

সামূদ জাতি যে কূপ থেকে পানি পান করত এবং জন্তুদেরকে পান করাত, এ উষ্ট্রীও সে কূপ থেকেই পানি পান করত। কিন্তু এ আশ্চর্য ধরনের উষ্ট্রী যখন পানি পান করত, তখন পানি নিঃশেষে পান করে ফেলত। হযরত সালেহ্ (আ) আল্লাহ্‌র নির্দেশে ফায়সালা করে দিলেন যে, একদিন এ উষ্ট্রী পানি পান করবে এবং অন্য দিন সম্প্রদায়ের সবাই পানি নেবে। যেদিন উষ্ট্রী পানি পান করত সেদিন অন্যরা উষ্ট্রীর দুধ দ্বারা তাদের সব পাত্র ভর্তি করে নিত। কোরআনের অন্যত্র এভাবে পানি বন্টনের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে ঃ

وَنَبِّئْهُمْ اَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ—অর্থাৎ হে সালেহ্, তুমি স্বজাতিকে বলে দাও যে, কূপের পানি তাদের এবং উষ্ট্রীর মধ্যে বন্টন হবে ---একদিন উষ্ট্রীর এবং পরবর্তী দিন তাদের। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ফেরেশতারা এ বন্টন ব্যবস্থা দেখাশোনা করবে---যাতে কেউ এর খেলাফ করতে না পারে। অন্য এক আয়াতে আছে ঃ

هٰذِهٖ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَّلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ—অর্থাৎ এটি আল্লাহ্‌র উষ্ট্রী একদিন এর পানি এবং অন্য নির্দিষ্ট দিনের পানি তোমাদের।

দ্বিতীয় আয়াতে এ অবাধ্য ও অঙ্গীকার ভঙ্গকারী জাতির প্রতি শুভেচ্ছা ও তাদেরকে আযাব থেকে বাঁচানোর জন্য পুনরায় আল্লাহ্‌র নিয়ামতসমূহ স্মরণ করানো হয়েছে, যাতে তারা অবাধ্যতা পরিহার করে। বলা হয়েছে ঃ

وَاذْكُرُوْٓا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ عَادٍ وَّبَوَّاَكُمْ فِى الْاَرْضِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْ سُهُوْلِهَا قُصُوْرًا وَّتَنْحِتُوْنَ الْجِبَالَ بُيُوْتًا

এতে خلفاء শব্দটি خليفة-এর বহুবচন। এর অর্থ স্থলাভিষিক্ত ও প্রতিনিধি। قصور শব্দটি قصر-এর বহুবচন। এর অর্থ উচ্চ অট্টালিকা ও প্রাসাদ। تنحتون শব্দটি نحت থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ প্রস্তর খোদাই করা। جبال শব্দটি جبل-এর বহুবচন। এর অর্থ পাহাড়। بيوتا শব্দটি بيت-এর বহুবচন। এর অর্থ প্রকোষ্ঠ। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামত স্মরণ কর যে, তিনি 'আদ জাতিকে ধ্বংস করে তাদের স্থলে তোমাদের অভিষিক্ত করেছেন, তাদের ঘরবাড়ী ও সহায়-সম্পত্তি তোমাদের দান করেছেন এবং তাদের এ শিল্পকার্য শিক্ষা দিয়েছেন

যে, উন্মুক্ত জায়গায় তোমরা প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্মাণ করে ফেল এবং পাহাড়ের গাত্র খোদাই করে তাতে প্রকোষ্ঠ তৈরী কর। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ فَاذْكُرُوا

اٰلَاءَ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ—অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নিয়ামতসমূহ স্মরণ কর, অনুগ্রহ স্বীকার কর, তাঁর আনুগত্য অবলম্বন কর এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করে ফিরো না।

জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে কতিপয় মৌলিক ও শাখাগত মাস'আলা জানা যায়।

এক. ধর্মের মূলবিশ্বাসসমূহে সব পয়গম্বরই একমত এবং তাঁদের সবার শরীয়তই অভিন্ন। সবারই দাওয়াত ছিল এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করা এবং এর বিরুদ্ধাচরণের কারণে ইহকাল ও পরকালের শাস্তির ভয় প্রদর্শন করা।

দুই. পূর্ববর্তী সব উম্মতের মধ্যে এই হয়েছে যে, সম্প্রদায়ের বিত্তশালী ও প্রধানরা পয়গম্বরদের দাওয়াত কবূল করেনি। ফলে তারা ইহকালেও ধ্বংস হয়েছে এবং পরকালেও শাস্তির যোগ্য হয়েছে।

তিন. তফসীর কুরতুবীতে বলা হয়েছে, এ আয়াত দ্বারা জানা গেল যে, আল্লাহ্‌র নিয়ামতসমূহ দুনিয়াতে কাফিরদেরকেও দান করা হয়; যেমন 'আদ ও সামূদ জাতির সামনে আল্লাহ্ তা'আলা ধন-সম্পদ ও শক্তির দ্বার খুলে দিয়েছিলেন।

চার. তফসীর কুরতুবীতে আছে, এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, সুউচ্চ প্রাসাদ ও বৃহদাকার অট্টালিকা নির্মাণ করাও আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামত এবং বৈধ।

এটা ভিন্ন কথা যে, কোন নবী-রসূল ও ওলীগণ অট্টালিকা পছন্দ করেননি। কারণ, এগুলো মানুষকে গাফিল করে দেয়। রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ সম্পর্কে যেসব বক্তব্য বর্ণিত আছে, সেগুলো এ ধরনেরই।

তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াতে সামূদ জাতির দু'দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত সংলাপ উল্লেখ করা হয়েছে। একদল সালেহ্ (আ)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। দ্বিতীয় দল ছিল অবিশ্বাসী কাফিরদের। বলা হয়েছে ঃ

قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِمَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ

অর্থাৎ সালেহ্ (আ)-র সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা অহংকারী ছিল, তারা তাদেরকে বলল, যাদেরকে দুর্বল ও হীন মনে করা হত—অর্থাৎ যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। ইমাম রাযী তফসীর কবীরে বলেন ঃ এখানে দু'দলের দু'টি গুণ ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু কাফিরদের গুণটি

صيغة معروف-এ إسْتَكْبَرُوْا বলা হয়েছে এবং মু'মিনদের গুণটি صيغة مجهول-এ إسْتُضْعِفُوْا বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, কাফিরদের অহংকার গুণটি ছিল তাদের নিজস্ব কাজ, যা দণ্ডনীয় ও তিরস্কৃত, পরিণামে শাস্তির কারণ হয়েছে ; পক্ষান্তরে মু'মিনদের যে বিশেষণ তারা বর্ণনা করত যে, এরা নিকৃষ্ট, হীন ও দুর্বল, এটা কাফিরদেরই কথা, স্বয়ং মু'মিনদের বাস্তব অবস্থা ও বিশেষণ নয়, যা তিরস্কারযোগ্য হতে পারে। বরং তিরস্কার তাদেরই প্রাপ্য, যারা বিনা কারণে তাদেরকে হীন ও দুর্বল বলত ও মনে করত। উভয় দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত সংলাপ ছিল এই যে, কাফিররা মু'মিনদের বলল ঃ তোমরা কি বাস্তবিকই জান যে, সালেহ্ (আ) তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে প্রেরিত রসূল ?

উত্তরে মু'মিনরা বলল ঃ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যে হিদায়তসহ তিনি প্রেরিত হয়েছেন, আমরা সেগুলোর প্রতি বিশ্বাসী।

তফসীর কাশশাফে বলা হয়েছে ঃ সামূদ জাতির মু'মিনরা কি চমৎকার অলংকার-পূর্ণ উত্তরই না দিয়েছে যে, তোমরা এ আলোচনায় ব্যস্ত রয়েছ যে, তিনি রসূল কি না। আসলে এটা আলোচনার বিষয়ই নয় ; বরং জাজ্জ্বল্যমান ও নিশ্চিত। সাথে সাথে এটাও নিশ্চিত যে, তিনি যা বলেন, তা আল্লাহ্ তা'আলার কাছ থেকে আনীত পয়গাম। জিজ্ঞাস্য বিষয় কিছু থাকলে তা এই যে, কে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং কে করে না। আল্লাহ্র ফযলে আমরা তাঁর আনীত সব নির্দেশের প্রতিই বিশ্বাসী।

কিন্তু তাদের অলংকারপূর্ণ উত্তর শুনেও সামূদ জাতি পূর্ববৎ ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে বলল ঃ যে বিষয়ের প্রতি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছ, আমরা তা মানি না। দুনিয়ার মহব্বত, ধন-সম্পদ ও শক্তির মত্ততা থেকে আল্লাহ্ তা'আলা নিরাপদ রাখুন ! এগুলো মানুষের চোখে পর্দা হয়ে দাঁড়ায়। ফলে তারা জাজ্জ্বল্যমান বিষয়কেও অস্বীকার করতে শুরু করে।

فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَٰصَٰلِحُ ائْتِنَا بِمَا
تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧٧﴾ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي
دَارِهِمْ جَٰثِمِينَ ﴿٧٨﴾ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَٰقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ
رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّٰصِحِينَ ﴿٧٩﴾

(৭৭) অতঃপর তারা সে উষ্ট্রীকে হত্যা করল এবং স্বীয় পালনকর্তার আদেশ অমান্য করল। তারা বলল ঃ হে সালেহ, নিয়ে এস যদ্দ্বারা আমাদেরকে ভয় দেখাতে, যদি তুমি রসূল হয়ে থাক ! (৭৮) অতঃপর এসে আপতিত হলো তাদের উপর ভূমিকম্প। ফলে সকাল

বেলায় নিজ নিজ গৃহে তারা লাশ হয়ে পড়ে রইল। (৭৯) সালেহ তাদের কাছ থেকে প্রস্থান করল এবং বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের কাছে স্বীয় পালনকর্তার পয়গাম পৌঁছিয়েছি এবং তোমাদের মঙ্গল কামনা করেছি; কিন্তু তোমরা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীদেরকে ভালবাস না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[মোট কথা, তারা সালেহ্ (আ)-র প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করল না এবং উষ্ট্রীর নির্ধারিত হকও আদায় করল না, বরং] অতঃপর উষ্ট্রীকে (-ও) হত্যা করল এবং স্বীয় পালনকর্তার আদেশ (অর্থাৎ একত্ববাদ ও রিসালতের আদেশও) অমান্য করল এবং (তারও উপর ঔদ্ধত্য এই দেখাল যে,) তারা বলল ঃ হে সালেহ্! তুমি যে বিষয়ের (অর্থাৎ যে শাস্তির) ভয় আমাদেরকে দেখাতে তা নিয়ে এস, যদি তুমি পয়গম্বরই হয়ে থাক। কেননা, পয়গম্বরের সত্যবাদী হওয়া অপরিহার্য। অতঃপর এসে আপতিত হলো তাদের উপর ভূমিকম্প। অতএব (দেখা গেল,) ভোরবেলায় তারা নিজ নিজ গৃহে অধোমুখে পড়ে রয়েছে। [তখন সালেহ্ (আ) তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে গেল এবং অনুতাপ ভরে স্বগত সম্বোধন করে] বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! আমি তো তোমাদের কাছে স্বীয় পালনকর্তার নির্দেশ পৌঁছে দিয়েছিলাম (যা পালন করলে তোমরা মুক্তি পেতে) এবং আমি তোমাদের (অনেক) মঙ্গল কামনা করেছি (কত আদর-যত্ন করে বুঝিয়েছি) কিন্তু (পরিতাপের বিষয়,) তোমরা হিতাকাঙ্ক্ষীদের পছন্দই করতে না (তাই আমার কথায় কর্ণপাত করলে না এবং পরিণামে এই অশুভ দিন দেখেছ)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, সালেহ্ (আ)-র দোয়ায় পাহাড়ের একটি বিরাট প্রস্তরখণ্ড বিস্ফারিত হয়ে আশ্চর্য ধরনের এক উষ্ট্রী বের হয়ে এসেছিল। আল্লাহ্ তা'আলা এ উষ্ট্রীকেই এ সম্প্রদায়ের জন্য সর্বশেষ পরীক্ষার বিষয় করে দিয়েছিলেন। সেমতে সে জনপদের সব মানুষ ও জীবজন্তু যে কূপ থেকে পানি পান করত, উষ্ট্রী তার সব পানি পান করে ফেলত। তাই সালেহ্ (আ) তাদের জন্য পানির পালা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন যে, একদিন উষ্ট্রী পানি পান করবে এবং অন্য দিন জনপদের অধিবাসীরা।

সুতরাং এ উষ্ট্রীর কারণে সামূদ জাতির বেশ অসুবিধা হচ্ছিল। ফলে তারা এর ধ্বংস কামনা করত। কিন্তু আযাবের ভয়ে নিজেরা একে ধ্বংস করতে উদ্যোগী হতো না।

যে সুবৃহৎ প্রতারণার মাধ্যমে শয়তান মানুষের বুদ্ধি-জ্ঞান ও চেতনাকে বিলুপ্ত করে দেয়, তা হচ্ছে নারীর প্রলোভন। সুতরাং সম্প্রদায়ের পরমাসুন্দরী কতিপয় নারী বাজি রাখল যে, যে ব্যক্তি এ উষ্ট্রীকে হত্যা করবে, সে আমাদের এবং আমাদের কন্যাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা গ্রহণ করতে পারবে।

সম্প্রদায়ের দু'জন যুবক 'মিসদা' ও 'কাসার' এ নেশায় মত্ত হয়ে উষ্ট্রীকে হত্যা করার

জন্য বেরিয়ে পড়ল। তারা উষ্ট্রীর পথে একটি বড় প্রস্তরখণ্ডের আড়ালে আত্মগোপন করে বসে রইল। উষ্ট্রী সামনে আসতেই 'মিসদা' তার প্রতি তীর নিক্ষেপ করল এবং 'কাসার' তরবারির আঘাতে তার পা কেটে হত্যা করল।

কোরআন পাক তাকেই সামূদ জাতির সর্ববৃহৎ হতভাগ্য বলে আখ্যা দিয়ে বলেছে ঃ

اِذِ انۢبَعَثَ اَشۡقٰىهَا কেননা, তার কারণেই গোটা সম্প্রদায় আযাবে পতিত হয়।

উষ্ট্রী হত্যার ঘটনা জানার পর সালেহ্ (আ) স্বীয় সম্প্রদায়কে আল্লাহ্র নির্দেশ জানিয়ে দিলেন যে, এখন থেকে তোমাদের জীবনকাল মাত্র তিন দিন অবশিষ্ট রয়েছে।

فَتَمَتَّعُوۡا فِىۡ دَارِكُمۡ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ ذٰلِكَ وَعۡدٌ غَيۡرُ مَكۡذُوۡبٍ — অর্থাৎ আরও তিন দিন আরাম করে নাও (এরপরই আযাব নেমে আসবে)। এ ওয়াদা সত্য, এর ব্যতিক্রম হওয়া সম্ভবপর নয়। কিন্তু যে জাতির দুঃসময় ঘনিয়ে আসে, তার জন্য কোন উপদেশ ও হুঁশিয়ারি কার্যকর হয় না। সুতরাং সালেহ্ (আ)-র একথা শুনেও তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে বলল ঃ এ শাস্তি কিভাবে এবং কোথা থেকে আসবে? এর লক্ষণ কি হবে?

সালেহ্ (আ) বললেন ঃ তাহলে আযাবের লক্ষণও শুনে নাও---আগামীকাল বৃহস্পতিবার তোমাদের নারী-পুরুষ, যুবক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সবার মুখমণ্ডল হলদে ফ্যাকাশে হয়ে যাবে। অতঃপর পরশু শুক্রবার সবার মুখমণ্ডল গাঢ় লালবর্ণ ধারণ করবে। অতঃপর শনিবার দিন সবার মুখমণ্ডল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হয়ে যাবে। এটাই হবে তোমাদের জীবনের শেষ দিন। হতভাগ্য জাতি এ কথা শুনেও ক্ষমা প্রার্থনা করার পরিবর্তে স্বয়ং সালেহ্ (আ)-কেই হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিল। তারা ভাবল, যদি সে সত্যবাদী হয় এবং আমাদের উপর আযাব আসেই, তবে আমরা নিজেদের পূর্বে তার ভবলীলাই সাঙ্গ করে দিই না কেন? পক্ষান্তরে যদি সে মিথ্যাবাদী হয়, তবে মিথ্যার সাজা ভোগ করুক। সামূদ জাতির এ সংকল্পের বিষয় কোরআন পাকের অন্যত্র বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কিছু লোক রাতের বেলা সালেহ্ (আ)-কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তাঁর গৃহপানে রওয়ানা হল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা পথিমধ্যেই প্রস্তর বর্ষণে ওদেরকে ধ্বংস করে দিলেন।

وَمَكَرُوۡا مَكۡرًا وَّمَكَرۡنَا مَكۡرًا وَّهُمۡ لَا يَشۡعُرُوۡنَ — অর্থাৎ তারাও গোপন ষড়যন্ত্র করল এবং আমিও প্রত্যুত্তরে এমন কৌশল অবলম্বন করলাম যে, তারা তা জানতেই পারল না। বৃহস্পতিবার ভোরে সালেহ্ (আ)-র কথা অনুযায়ী সবার মুখমণ্ডল গভীর হলুদ রঙে আচ্ছাদিত হয়ে গেল। প্রথম লক্ষণ সত্য হওয়ার পরও জালিমরা ঈমানের প্রতি মনোনিবেশ করল না ; বরং তারা সালেহ্ (আ)-র প্রতি আরও চটে গেল এবং সমগ্র জাতি তাঁকে হত্যা করার জন্য ঘোরাফেরা করতে লাগল। আল্লাহ্ রক্ষা করুন, তাঁর গযবেরও লক্ষণাদি থাকে। মানুষের মন-মস্তিষ্ক যখন অধোমুখী হয়ে যায়, তখন লাভকে ক্ষতি ও ক্ষতিকে লাভ এবং মন্দকে ভাল মনে করতে থাকে।

দ্বিতীয় দিন ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সবার মুখমণ্ডল লাল এবং তৃতীয় দিন ঘোর কাল হয়ে গেল, তখন সবাই নিরাশ হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল যে, কোন্ দিক থেকে কিভাবে আযাব আসে।

এমতাবস্থায় ভীষণ ভূমিকম্প শুরু হল এবং উপর থেকে বিকট ও ভয়াবহ চিৎকার শোনা গেল। ফলে সবাই একযোগে বসা অবস্থায় অধোমুখী হয়ে ধরাশায়ী হল। আলোচ্য আয়াতসমূহে ভূমিকম্পের কথা উল্লিখিত রয়েছে। فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ এখানে رَجْفَةٌ শব্দের অর্থ ভূমিকম্প।

অন্যান্য আয়াতে أَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ-ও বলা হয়েছে। صَيْحَةٌ শব্দের অর্থ ভীষণ চিৎকার ও বিকট শব্দ। উভয় আয়াতদৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, তাদের উপর উভয় প্রকার আযাবই এসেছিল; নিচের দিক থেকে ভূমিকম্প আর উপর দিক থেকে বিকট চিৎকার। ফলে তারা فَأَصْبَحُوا فِى دَارِهِمْ جَاثِمِينَ-এ পরিণত হয়েছিল। جَاثِم শব্দটি جُثُوم ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ চেতনাহীন হয়ে পড়ে যাওয়া কিংবা বসে থাকা। (কামূস) অর্থাৎ যে যে অবস্থায় ছিল, সেভাবেই মৃত্যুমুখে পতিত হল।

نعوذ بالله من قهره وعذابه

এ কাহিনীর প্রধান অংশগুলো স্বয়ং কোরআন পাকের বিভিন্ন সূরায় এবং কিছু অংশ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। কিছু অংশ এমনও রয়েছে, যা তফসীরবিদরা ইসরাইলী (অর্থাৎ ইহুদী ও খৃস্টানদের) বর্ণনা থেকে সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু সেসব বর্ণনার উপর কোন ঘটনার প্রমাণ নির্ভরশীল নয়।

সহীহ্ বুখারীর এক হাদীসে বর্ণিত আছে, তাবুক যুদ্ধের সফরে রসূলুল্লাহ্ (সা) হিজর নামক সে স্থানটি অতিক্রম করেন, যেখানে সামূদ জাতির উপর আযাব এসেছিল। তিনি সাহাবায়ে কিরামকে নির্দেশ দেন, কেউ যেন এ আযাববিধ্বস্ত এলাকার ভিতরে প্রবেশ কিংবা এর কূপের পানি ব্যবহার না করে।---(মাযহারী)

কোন কোন হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ সামূদ জাতির উপর আপতিত আযাব থেকে আবূ রেগাল নামক এক ব্যক্তি ছাড়া কেউ প্রাণে বাঁচতে পারেনি। এ ব্যক্তি তখন মক্কায় এসেছিল। মক্কায় হেরেমের সম্মানার্থে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বাঁচিয়ে রাখেন। অবশেষে যখন সে হেরেম থেকে বাইরে যায়, তখন সামূদ জাতির আযাব তার উপরও পতিত হয় এবং সেও মৃত্যুমুখে পতিত হয়। রসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবায়ে কিরামকে মক্কার বাইরে আবূ রেগালের কবরের চিহ্নও দেখান এবং বলেনঃ তার সাথে স্বর্ণের একটি ছড়িও দাফন হয়ে গিয়েছিল। সাহাবায়ে কিরাম কবর খনন করলে ছড়িটি পাওয়া যায়। এ রেওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে যে, তায়েফের অধিবাসী সকীফ গোত্র আবূ রেগালেরই বংশধর।---(মাযহারী)

এসব আযাববিধ্বস্ত সম্প্রদায়ের বস্তিগুলোকে আল্লাহ্ তা'আলা ভবিষ্যৎ লোকদের জন্য শিক্ষাস্থল হিসাবে সংরক্ষিত রেখেছেন। কোরআন পাক আরবদেরকে বার বার হুঁশিয়ার করেছে যে, তোমাদের সিরিয়া গমনের পথে এসব স্থান আজও শিক্ষণীয় কাহিনী হয়ে বিদ্যমান রয়েছে ঃ لَمْ تَسْكُن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا

আযাবের ঘটনা বিবৃত করার পর বলা হয়েছে ঃ

فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ ○—অর্থাৎ স্বজাতির উপর আযাব নাযিল হওয়ার পর সালেহ্ (আ) ও ঈমানদাররা সে এলাকা পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে যান। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, তাঁর সাথে চার হাজার মু'মিন ছিল। তিনি সবাইকে নিয়ে ইয়ামনের 'হাজরামাওতে, চলে গেলেন। সেখানেই তাঁর ওফাত হয়। কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে তাঁর মক্কায় প্রস্থান এবং সেখানে ওফাতের কথাও জানা যায়।

আয়াতের বাহ্যিক অর্থে জানা যায় যে, সালেহ্ (আ) প্রস্থানকালে জাতিকে সম্বোধন করে বললেন ঃ হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের প্রতিপালকের পয়গাম পৌঁছে দিয়েছি এবং তোমাদের কল্যাণ কামনা করেছি ; কিন্তু আফসোস, তোমরা কল্যাণকামীদের পছন্দই কর না।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, সবাই যখন ধ্বংস হয়ে গেছে, তখন তাদের সম্বোধন করে লাভ কি? উত্তর এই যে, এক লাভ তো এই যে, এ থেকে অন্যরাও শিক্ষা লাভ করতে পারবে। রসূলুল্লাহ্ (সা) নিজেও বদর যুদ্ধে নিহত কোরায়েশ সর্দারদের এমনিভাবে সম্বোধন করে কিছু কথা বলেছিলেন। এছাড়া সালেহ্ (আ)-র এ সম্বোধন আযাব অবতরণের পূর্বেও হতে পারে---যদিও বর্ণনায় তা পরে উল্লেখ করা হয়েছে।

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا
مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ○ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن
دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ○ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ
إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ○
فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ ۖ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ○ وَأَمْطَرْنَا

عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٨٤﴾

(৮০) এবং আমি লূতকে প্রেরণ করেছি। যখন সে স্বীয় সম্প্রদায়কে বলল ঃ তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে সারা বিশ্বের কেউ করেনি? (৮১) তোমরা তো কামবশত পুরুষদের কাছে গমন কর নারীদেরকে ছেড়ে। এতে করে তোমরা সীমা অতিক্রম করছ। (৮২) তাঁর সম্প্রদায় এ ছাড়া কোন উত্তর দিল না যে, বের করে দাও এদেরকে জনপদ থেকে। এরা খুব পূত-পবিত্র থাকতে চায়। (৮৩) অতঃপর আমি তাঁকে ও তাঁর পরিবার-পরিজনকে বাঁচিয়ে দিলাম, কিন্তু তার স্ত্রী। সে তাদের মধ্যেই রয়ে গেল, যারা রয়ে গিয়েছিল। আমি তাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করলাম। (৮৪) অতঃপর দেখ, অপরাধীদের পরিণতি কেমন হয়েছে!

তসফীরের সার-সংক্ষেপ

এবং আমি লূত (আ)-কে (কতিপয় জনপদের দিকে পয়গম্বর করে) প্রেরণ করেছি। যখন সে স্বীয় সম্প্রদায় (অর্থাৎ উম্মত)-কে বলল ঃ তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে সারা দুনিয়ার কেউ করেনি? (অর্থাৎ) তোমরা পুরুষদের সাথে কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করছ নারীদেরকে ছেড়ে (এবং এ কাজ তোমরা কোন ধোঁকাবশত করছ না,) বরং (এ ব্যাপারে) তোমরা (মানবতার) সীমা অতিক্রম করেছ। বস্তুত (এসব বিষয়ে) তার সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে এছাড়া আর কোন (যুক্তিসঙ্গত) উত্তর ছিল না যে, (অবশেষে বাজে পন্থায়) তারা পরস্পর বলতে লাগল ঃ তাদেরকে (অর্থাৎ লূত ও তাঁর সঙ্গী মু'মিন-দেরকে) তোমাদের (এ) জনপদ থেকে বের করে দাও, (কেননা) তারা বড় পূত-পবিত্র সাজছে (এবং আমাদের অসাধু বলছে। কাজেই অসাধুদের মধ্যে সাধুরা কেন থাকবে? তারা বিদ্রূপছলে একথা বলেছিল)। অনন্তর (ব্যাপার যখন এতদূর গড়াল, তখন) আমি (এ জাতির প্রতি আযাব নাযিল করলাম এবং) লূত (আ) ও তাঁর সাথে সম্পর্ককারীদের (অর্থাৎ পরিবারবর্গ ও অন্যান্য মু'মিনকে এ আযাব থেকে) উদ্ধার করে নিলাম (অর্থাৎ পূর্বেই তাদের সেখান থেকে সরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল)। তাঁর স্ত্রী ব্যতীত; সে (বিশ্বাস স্থাপন না করার কারণে) তাদের মধ্যেই রয়ে গেল; যারা সেখানে আযাবে রয়ে গিয়েছিল এবং (তাদের আযাব ছিল এই যে,) আমি তাদের উপর এক নতুন ধরনের (অর্থাৎ প্রস্তরের) বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম। অতএব (হে দর্শক,) দেখে নাও অপরাধীদের পরিণাম কিরূপ হয়েছে! (তুমি মনোযোগ দিয়ে দেখলে আশ্চর্য বোধ করবে যে, অবাধ্যতার কি পরিণাম হয়)!

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পয়গম্বর ও তাঁদের উম্মতদের কাহিনী পর্বের চতুর্থ কাহিনী হচ্ছে হযরত লূত (আ)-এর কাহিনী।

লূত (আ) ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র। উভয়ের মাতৃভূমি ছিল পশ্চিম ইরাকে বসরার নিকটবর্তী প্রসিদ্ধ বাবেল শহর। এখানে মূর্তিপূজার ব্যাপক প্রচলন ছিল। স্বয়ং হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পরিবারও মূর্তিপূজায় লিপ্ত ছিল। তাদের হিদায়তের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা ইবরাহীম (আ)-কে পয়গম্বর করে পাঠান। কিন্তু সবাই তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে এবং ব্যাপারটি নমরূদের অগ্নি পর্যন্ত গড়ায়। স্বয়ং পিতা তাঁকে গৃহ থেকে বহিষ্কার করার হুমকি দেন।

নিজ পরিবারের মধ্যে শুধু সহধর্মিণী হযরত সারা ও ভ্রাতুষ্পুত্র লূত মুসলমান হন। فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ অবশেষে তাদেরকে সাথে নিয়ে হযরত ইবরাহীম (আ) দেশ ছেড়ে শাম দেশে হিজরত করেন। জর্দান নদীর তীরে পৌঁছার পর আল্লাহ্র নির্দেশে হযরত ইবরাহীম (আ) কেনানে গিয়ে অবস্থান করেন, যা বায়তুল মোকাদ্দাসের অদূরেই অবস্থিত।

লূত (আ)-কেও আল্লাহ্ তা'আলা নবুয়ত দান করে জর্দান ও বায়তুল মোকাদ্দাসের মধ্যবর্তী সাদুমের অধিবাসীদের পথ প্রদর্শনের জন্য প্রেরণ করেন। এ এলাকায় সাদুম, আমুরা, উমা, সাবুবিম, বালে, অথবা সূগর নামক পাঁচটি বড় বড় শহর ছিল। কোরআন পাক বিভিন্ন স্থানে এদের সমষ্টিকে 'মু'তাফেকা' ও মু'তাফেকাত শব্দে বর্ণনা করেছে। এসব শহরের মধ্যে সাদুমকেই রাজধানী মনে করা হত। হযরত লূত (আ) এখানেই অবস্থান করতেন। এ এলাকার ভূমি ছিল উর্বর ও শস্য-শ্যামল। এখানে সর্বপ্রকার শস্য ও ফলের প্রাচুর্য ছিল। (এসব ঐতিহাসিক তথ্য বাহরে মুহীত, মাযহারী, ইবনে কাসীর, আল-মানার প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে)।

কোরআন পাকের ভাষায় মানুষের সাধারণ অভ্যাস হচ্ছে ঃ

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى —অর্থাৎ মানুষ যখন দেখে, সে কারও মুখাপেক্ষী নয়, তখন অবাধ্যতা শুরু করে। তাদের সামনেও আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় নিয়ামতের দ্বার খুলে দিয়েছিলেন। তারা মানুষের সাধারণ অভ্যাস অনুযায়ী ধনৈশ্বর্যের নেশায় মত্ত হয়ে বিলাস-ব্যসন, কামপ্রবৃত্তি ও লোভ-লালসার জালে এমনভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়ে যে, লজ্জা-শরম ও ভালমন্দের স্বভাবজাত পার্থক্যও বিস্মৃত হয়ে যায়। তারা এমন প্রকৃতি-বিরুদ্ধ নির্লজ্জতায় লিপ্ত হয়, যা হারাম ও গোনাহ্ তো বটেই, সুস্থ স্বভাবের কাছে ঘৃণ্য হওয়ার কারণে সাধারণ জন্তু-জানোয়ারও এর নিকটবর্তী হয় না।

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত লূত (আ)-কে তাদের হিদায়তের জন্য নিযুক্ত করেন। তিনি স্বজাতিকে হুঁশিয়ার করে বলেন ঃ

أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِيْنَ —অর্থাৎ তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ কর, যা তোমাদের পূর্বে পৃথিবীর কেউ করেনি?

যিনা তথা ব্যভিচার সম্পর্কে কোরআন পাক إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً আলিফ ও লাম ব্যতিরেকেই فاحشة শব্দ ব্যবহার করেছে। কিন্তু এখানে আলিফ-লামসহ الفاحشة বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ স্বভাববিরুদ্ধ ব্যভিচার যেন একাই সমস্ত অশ্লীলতার সমাহার এবং যিনার চাইতেও কঠোর অপরাধ।

এরপর বলা হয়েছে ঃ এ নির্লজ্জ কাজ তোমাদের পূর্বে পৃথিবীতে কেউ করেনি। আমর ইবনে দীনার বলেন ঃ এ জাতির পূর্বে পৃথিবীতে কখনও এহেন কুকর্ম দেখা যায়নি।---(মাযহারী) সাদুমবাসীদের পূর্বে কোন ঘোরতর মন্দ ব্যক্তির চিন্তাও এদিকে যায়নি। উমাইয়া খলীফা আবদুল মালিক বলেন ঃ কোরআনে লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের ঘটনা উল্লিখিত না হলে আমি কল্পনাও করতে পারতাম না যে, কোন মানুষ এরূপ কাজ করতে পারে।---(ইবনে কাসীর)

এতে তাদের নির্লজ্জতার কারণে দু'দিক দিয়ে হুঁশিয়ার করা হয়েছে। এক. অনেক গোনাহে মানুষ পরিবেশ অথবা পূর্ববর্তীদের অনুকরণের কারণে লিপ্ত হয়ে যায় যদিও তা কোন শরীয়তসম্মত ওযর নয় ; কিন্তু সাধারণের দৃষ্টিতে তাকে কোন-না-কোন স্তরে ক্ষমা-যোগ্য মনে করা যায়। কিন্তু যে গোনাহ্ পূর্বে কেউ করেনি এবং তা করার বিশেষ কোন কারণও নেই, তা নিঃসন্দেহে অধিক শাস্তির যোগ্য। দুই. যে ব্যক্তি কোন মন্দ কাজ কিংবা কুপ্রথার উদ্ভাবন ও প্রথম প্রচলন করে, তার উপর তার নিজের কাজের গোনাহ্ ও শাস্তি তো চাপেই, সাথে সাথে ঐসব লোকের শাস্তিও তার গর্দানে চেপে বসে, যারা কিয়ামত পর্যন্ত তার সে কাজে প্রভাবিত হয়ে গোনাহে লিপ্ত হয়।

দ্বিতীয় আয়াতে তাদের এ নির্লজ্জতাকে আরও স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করে বলা হয়েছে ঃ তোমরা নারীদের বাদ দিয়ে পুরুষদের সাথে কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ কর। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষের স্বভাবজাত কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা একটি হালাল ও জায়েয পন্থা নির্ধারণ করেছেন এবং তা হচ্ছে নারীদের বিয়ে করা। এ পন্থা ছেড়ে অস্বাভাবিক পন্থা অবলম্বন করা একান্ত হীনতা ও বিকৃত চিন্তারই পরিচায়ক।

এ কারণে সাহাবী, তাবেয়ী ও মুজতাহিদরা এ অপরাধকে সাধারণ ব্যভিচারের চাইতে অধিক গুরুতর অপরাধ ও গোনাহ্ বলে সাব্যস্ত করেছেন। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) বলেন ঃ যারা এ কাজ করে, তাদের ঐ রকম শাস্তিই দেওয়া উচিত, যেমন লূত (আ)-এর সম্প্রদায়কে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষিত হয়েছে এবং মাটি উলটিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই এরূপ ব্যক্তিকে কোন উঁচু পাহাড় থেকে নিচে ফেলে দিয়ে উপর থেকে প্রস্তর বর্ষণ করা উচিত। মসনদে-আহ্মদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজায় হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর বাচনিক বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) এরূপ ব্যক্তিদের সম্পর্কে বলেছেন ঃ فاقتلوا الفاعل و المفعول به অর্থাৎ এ কাজে জড়িত উভয় ব্যক্তিকে হত্যা কর।---(ইবনে কাসীর)

আয়াতের শেষে বলা হয়েছেঃ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ অর্থাৎ তোমরা মনুষ্যত্বের সীমা অতিক্রমকারী সম্প্রদায়। প্রত্যেক কাজে সীমা অতিক্রম করাই তোমাদের আসল রোগ। যৌন কামনার ক্ষেত্রেও তোমরা আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা ডিঙিয়ে স্বভাববিরুদ্ধ কাজে লিপ্ত হয়েছ!

তৃতীয় আয়াতে লূত (আ)-এর উপদেশের জবাবে তাঁর সম্প্রদায়ের উক্তি বর্ণনা করে বলা হয়েছেঃ তাদের দ্বারা যখন কোন যুক্তিসঙ্গত জবাব দেওয়া সম্ভবপর হল না, তখন রাগের বশবর্তী হয়ে পরস্পরে বলতে লাগলঃ এরা বড় পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন বলে দাবী করে। এদের চিকিৎসা এই যে, এদেরকে বস্তি থেকে বের করে দাও।

তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াতে সামূদ সম্প্রদায়ের বক্রতা ও বেহায়াপনার আসমানী শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে, গোটা জাতিই আল্লাহ্‌র আযাবে পতিত হল। শুধু লূত (আ) ও তাঁর কয়েকজন সঙ্গী আযাব থেকে বেঁচে রইলেন। কোরআনের ভাষায়ঃ ৪ أَنْجَيْنَا وَأَهْلَهُ বলা হয়েছে। অর্থাৎ আমি লূত ও তাঁর পরিবারকে আযাব থেকে বাঁচিয়ে রেখেছি। 'আহ্‌ল' সন্তানাদি তথা পরিবারকে বলা হয়। এ সম্পর্কে কোন কোন তফসীরবিদ বলেনঃ তাঁর পরিবারের মধ্যে দু'টি কন্যা মুসলমান হয়েছিল; কিন্তু তাঁর সহধর্মিণী মুসলমান হয়নি। কোরআন পাকের অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছেঃ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ অর্থাৎ সমগ্র বস্তির মধ্যে একটি ঘর ছাড়া কোন মুসলমান ছিল না। এতে বাহ্যত বোঝা যায় যে, লূত (আ)-এর ঘরের লোকই শুধু মুসলমান ছিল। সুতরাং তারাই আযাব থেকে মুক্তি পেল। অবশ্য তাদের মধ্যে তাঁর স্ত্রী অন্তর্ভুক্ত ছিল না। কোন কোন তফসীরবিদ বলেনঃ আহ্‌লের অর্থ ব্যাপক। এতে পরিবারের লোকজন এবং অন্যান্য মুসলমানকেও বোঝানো হয়েছে। সার কথা এই যে, গুণা-গুণতি কয়েকজন মুসলমান ছিল। তাদের আযাব থেকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ্ তা'আলা লূত (আ)-কে নির্দেশ দেন যে, স্ত্রী ব্যতীত অন্যান্য পরিবার-পরিজন ও সম্পর্কশীল লোকদের নিয়ে শেষরাত্রে বস্তি থেকে বের হয়ে যান এবং পেছনে ফিরে দেখবেন না। কেননা, আপনি যখন বস্তি থেকে বের হয়ে যাবেন, তখনই কালবিলম্ব না করে আযাব এসে যাবে।

হযরত লূত (আ) এ নির্দেশ মত স্বীয় পরিবার-পরিজন ও সম্পর্কশীলদের নিয়ে শেষ রাত্রে সাদুম ত্যাগ করেন। তাঁর স্ত্রী প্রসঙ্গে দু'রকম রেওয়ায়েতই বর্ণিত রয়েছে। এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী সে সঙ্গে রওয়ানাই হয়নি। দ্বিতীয় রেওয়ায়েতে আছে, কিছু দূর সঙ্গে চলার পর আল্লাহ্‌র নির্দেশের বিপরীতে পেছনে ফিরে বস্তিবাসীদের অবস্থা দেখতে চেয়েছিল।

ফলে সাথে সাথে আযাব এসে তাকেও স্পর্শ করল। কোরআন পাকের বিভিন্ন জায়গায় এ ঘটনাটি সংক্ষেপে ও বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এখানে তৃতীয় আয়াতে শুধু বলা হয়েছে যে, আমি লূত (আ) ও তাঁর পরিবার-পরিজনকে আযাব থেকে মুক্তি দিয়েছি। কিন্তু তাঁর সহধর্মিণী আযাবে লিপ্ত রয়ে গেছে। শেষ রাত্রে বস্তি ত্যাগ করা এবং পিছন ফিরে না দেখার নির্দেশ কোরআন পাকের অন্যান্য আয়াতেও উল্লেখ রয়েছে।

চতুর্থ আয়াতে আযাব সম্পর্কে সংক্ষেপে এটুকুই বলা হয়েছে যে, তাদের উপর এক অভিনব বৃষ্টি বর্ষণ করা হয়। সূরা হূদে এ আযাবের বিস্তারিত অবস্থা উল্লেখ করে বলা হয়েছে ঃ

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ○

অর্থাৎ যখন আমার আযাব এসে গেল, তখন আমি বস্তিটিকে উল্টে দিলাম এবং তাদের উপর স্তরে স্তরে প্রস্তর বর্ষণ করলাম যা আপনার পালনকর্তার নিকট চিহ্নযুক্ত ছিল। সে বস্তিটি এ কাফিরদের থেকে বেশী দূরে নয়।

এতে বোঝা যাচ্ছে যে, উপর থেকে প্রস্তর বর্ষিত হয়েছে এবং নিচে থেকে জিবরাঈল (আ) গোটা ভূখণ্ডকে উপরে তুলে উল্টে দিয়েছেন। বর্ষিত প্রস্তরসমূহ স্তরে স্তরে একত্রিত ছিল। অর্থাৎ এমন অবিরাম ধারায় বর্ষিত হয়েছিল যে, স্তরে স্তরে জমা হয়ে গিয়েছিল। এসব প্রস্তর চিহ্নযুক্ত ছিল। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ প্রত্যেক পাথরে ঐ ব্যক্তির নাম লিখিত ছিল, যাকে খতম করার জন্য পাথরটি নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। সূরা হিজরের আয়াতে এ আযাবের বর্ণনার পূর্বে বলা হয়েছে ঃ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ —অর্থাৎ সূর্যোদয়ের সময় বিকট শব্দ তাদেরকে পাকড়াও করল।

এতে জানা যায় যে, প্রথমে আকাশ থেকে একটি বিকট চিৎকার ধ্বনি এবং এরপর অন্যান্য আযাব এসেছে। বাহ্যত বোঝা যায় যে, চিৎকার ধ্বনির পর প্রথমে ভূখণ্ড উল্টিয়ে দেওয়া হয়। অতঃপর তাদেরকে অধিকতর লাঞ্ছিত করার জন্য উপর থেকে প্রস্তরবৃষ্টি বর্ষণ করা হয়। তাছাড়া এমনও হতে পারে যে, প্রথমে প্রস্তরবৃষ্টি বর্ষণ করা হয় এবং পরে ভূখণ্ড উল্টিয়ে দেওয়া হয়। কারণ, কোরআনের বর্ণনা পদ্ধতিতে যে বিষয়টি আগে উল্লেখ করা হয়, তা বাস্তবেও আগেই সংঘটিত হবে, তা অপরিহার্য নয়।

লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের উপর পতিত ভয়াবহ আযাবসমূহের মধ্যে ভূখণ্ড উল্টিয়ে দেওয়ার আযাবটি তাদের অশ্লীল ও নির্লজ্জ কাজের সাথে বিশেষ সঙ্গতিও রাখে। কারণ, তারা সিদ্ধ পন্থার বিপরীত কাজ করেছিল।

সূরা হূদে বর্ণিত আয়াতসমূহের শেষে কোরআন পাক আরবদের হুঁশিয়ার করে একথাও

বলেছে যে, وَمَا هِيَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ —অর্থাৎ উল্টে দেওয়া বস্তিগুলো জালিমদের কাছ থেকে বেশী দূরে অবস্থিত নয়। সিরিয়া গমনের পথে সব সময়ই সেগুলো তাদের চোখের সামনে পড়ে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তারা তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না।

এ দৃশ্য শুধু কোরআন অবতরণের সময়ই নয়, আজও বিদ্যমান রয়েছে। বায়তুল-মুকাদ্দাস ও জর্দান নদীর মাঝখানে আজও এ ভূখণ্ডটি 'লূত সাগর' অথবা 'মৃত সাগর' নামে পরিচিত! এর ভূভাগ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অনেক নিচে অবস্থিত। এর একটি বিশেষ অংশে নদীর আকারে আশ্চর্য ধরনের পানি বিদ্যমান। এ পানিতে কোন জন্তু, প্রাণী এমনকি মাছ, ব্যাঙ পর্যন্ত জীবিত থাকতে পারে না। এ কারণেই একে মৃত সাগর বলা হয়। কথিত আছে, এটাই সাদুমের অবস্থান স্থল।

وَإِلٰى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ
مِّنْ إِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۖ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ
وَالْمِيْزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوْا فِي الْأَرْضِ
بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝٨٥ وَلَا
تَقْعُدُوْا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُوْنَ وَتَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ
آمَنَ بِهٖ وَتَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۚ وَاذْكُرُوْٓا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيْلًا
فَكَثَّرَكُمْ ۖ وَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ۝٨٦ وَإِنْ كَانَ
طَآئِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوْا بِالَّذِيْٓ أُرْسِلْتُ بِهٖ وَطَآئِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوْا
فَاصْبِرُوْا حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ بَيْنَنَا ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ۝٨٧

(৮৫) আমি মাদইয়ানের প্রতি তাদের ভাই শোয়ায়েবকে প্রেরণ করেছি। সে বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে প্রমাণ এসে গেছে। অতএব, তোমরা মাপ ও ওজন পূর্ণ কর এবং মানুষকে তাদের দ্রব্যাদি কম দিয়ো না এবং ভূপৃষ্ঠের সংস্কার সাধন করার পর তাতে অনর্থ সৃষ্টি করো না। এই হল তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। (৮৬) তোমরা পথে-ঘাটে এ কারণে বসে থেকো না যে, আল্লাহ্‌র

প্রতি বিশ্বাসীদের হুমকি দেবে, আল্লাহ্‌র পথে বাধা সৃষ্টি করবে এবং তাতে বক্রতা অনুসন্ধান করবে। স্মরণ কর যখন তোমরা সংখ্যায় অল্প ছিলে, অতঃপর আল্লাহ্ তোমাদেরকে অধিক করেছেন এবং লক্ষ্য কর কিরূপ অশুভ পরিণতি হয়েছে অনর্থকারীদের। (৮৭) আর যদি তোমাদের একদল ঐ বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, যা আমার হাতে প্রেরিত হয়েছে এবং একদল বিশ্বাস স্থাপন না করে তবে সবর কর যে পর্যন্ত আল্লাহ্ আমাদের মধ্যে মীমাংসা না করে দেন। তিনিই শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং আমি মাদইয়ানের (অর্থাৎ মাদইয়ানের অধিবাসীদের) প্রতি তাদের ভাই শোয়ায়েব (আ)-কে (পয়গম্বর করে) পাঠিয়েছি। সে (মাদইয়ানবাসীদের) বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায় ! তোমরা (শুধুমাত্র) আল্লাহ্‌র ইবাদত কর। তাঁকে ছাড়া তোমাদের উপাস্য (হওয়ার যোগ্য) কেউ নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে (আমার নবী হওয়ার) প্রকাশ্য প্রমাণস্বরূপ মো'জেযা এসে গেছে। (যখন আমার নবুয়ত সপ্রমাণিত) অতএব, (শরীয়তের বিধি-বিধানে আমার কথা মান্য কর। সেমতে আমি বলি,) তোমরা মাপ ও ওজন পূর্ণ কর এবং মানুষকে তাদের (প্রাপ্য) দ্রব্যাদি কম দিয়ো না (যেমন এটাই তোমাদের অভ্যাস) এবং ভূপৃষ্ঠে, (শিক্ষা, একত্ববাদ, পয়গম্বর প্রেরণ এবং মাপ ও ওজনে ন্যায়-বিচার ও অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে) তার সংস্কার সাধন করার পর অনর্থ বিস্তার করো না (অর্থাৎ এসব বিধানের বিরোধিতা ও কুফরী করো না। এগুলোই অনর্থের কারণ)। এটি (অর্থাৎ আমি যা বলছি, তাই পালন করা) তোমাদের জন্য (ইহকাল ও পরকালে) কল্যাণকর যদি তোমরা (আমাকে) সত্য বলে বিশ্বাস কর, (যার প্রমাণ রয়েছে। যদি বিশ্বাস করে পালন কর, তবে উল্লিখিত বিষয়সমূহ ইহকাল ও পরকালে তোমাদের জন্য উপকারী, পরকালে তো মুক্তি আছেই। আর ইহকালে শরীয়ত পালন করলে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় থাকে। বিশেষত মাপ ও ওজন পুরোপুরি দিলে ক্রেতা-বিক্রেতার মাঝে পারস্পরিক বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নতি লাভ করে)। এবং তোমরা এমন কোন উদ্দেশ্য নিয়ে পথে বসে থেকো না যে, আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদের (বিশ্বাস স্থাপন করার কারণে) হুমকি দেবে এবং (তাদেরকে) আল্লাহ্‌র পথ (অর্থাৎ ঈমান) থেকে বাধা দান করবে এবং এতে (এ পথে) বক্রতা (ও সন্দেহ) অনুসন্ধান করবে। (অর্থাৎ অনর্থক আপত্তি তুলে মানুষকে বিভ্রান্ত করবে। তারা উল্লিখিত পথভ্রষ্টতার সাথে সাথে অন্যকে পথভ্রষ্ট করার কাজেও লিপ্ত ছিল। পথে বসে তারা আগন্তুকদের এই বলে বিভ্রান্ত করত যে, শোয়ায়েবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো না। তাহলে আমরা তোমাদেরকে হত্যা করব। অতঃপর নিয়ামত স্মরণ করিয়ে উৎসাহ প্রদান এবং প্রতিশোধ স্মরণ করিয়ে ভয় প্রদর্শন করা হচ্ছে। অর্থাৎ) এবং স্মরণ কর, যখন তোমরা (সংখ্যায় অথবা অর্থ-সম্পদে) অল্প ছিলে। অতঃপর আল্লাহ্ তোমাদের (সংখ্যায় অথবা অর্থ-সম্পদে) বেশী করে দিয়েছেন (এ হচ্ছে ঈমানদারদের প্রতি উৎসাহ প্রদান।) এবং দেখ তো কিরূপ অশুভ পরিণতি হয়েছে অনর্থ-(অর্থাৎ কুফর, মিথ্যারোপ ও জুলুম), কারী-দের। যেমন কওমে নূহ্, 'আদ ও সামূদের ঘটনা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এমনিভাবে তোমাদের

উপরেও আযাব আসার আশংকা রয়েছে। এ হচ্ছে কুফরের কারণে ভীতি প্রদর্শন আর যদি (তোমরা এ কারণে আযাব না আসার সন্দেহ কর যে,) তোমাদের একদল সে বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, যা আমার হাতে প্রেরিত হয়েছে, এবং একদল বিশ্বাস স্থাপন না করে, (তবুও উভয় দল একই অবস্থায় রয়েছে, যারা বিশ্বাস করেনি, তাদের উপর কোন আযাব আসেনি। এতে বোঝা যায় যে, আপনার ভীতি প্রদর্শন অমূলক)। তবে (এ সন্দেহের উত্তর এই যে, তাৎক্ষণিক আযাব না আসায় একথা কেমন করে বোঝা গেল যে, আদৌ আযাব আসবে না)? সবর কর যে পর্যন্ত আমাদের (উভয় দলের) মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা (কার্যত) মীমাংসা না করে দেন (অর্থাৎ আযাব নাযিল করে মু'মিনদের রক্ষা করবেন এবং কাফিরদের ধ্বংস করে দেবেন)। বস্তুত তিনি শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী (তাঁর মীমাংসা সম্পূর্ণই সঙ্গত হয়ে থাকে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পয়গম্বরদের কাহিনী পরম্পরার পঞ্চম কাহিনী হচ্ছে হযরত শোয়ায়েব (আ) ও তাঁর সম্প্রদায়ের। আলোচ্য আয়াতসমূহে এ কাহিনীটিই বিবৃত হয়েছে।

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের বর্ণনা অনুযায়ী হযরত শোয়ায়েব (আ) ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পুত্র মাদইয়ানের বংশধর। হযরত লূত (আ)-এর সাথেও তাঁর আত্মীয়-তার সম্পর্ক ছিল। তাঁর বংশধরও মাদইয়ান নামে খ্যাত হয়েছে। যে জনপদে তারা বসবাস করত, তাও মাদইয়ান নামে অভিহিত হয়েছে। অতএব, 'মাদইয়ান' একটি জাতির ও একটি শহরের নাম। এ শহর অদ্যাবধি পূর্ব জর্দানের সামুদ্রিক বন্দর 'মায়ানের' অদূরে বিদ্যমান রয়েছে। কোরআন পাকের অন্যত্র মূসা (আ)-র কাহিনীতে বলা হয়েছে ঃ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ এতে এ জনপদটিকেই বোঝানো হয়েছে।---(ইবনে কাসীর)

হযরত শোয়ায়েব (আ)-কে চমৎকার বাগ্মিতার কারণে 'খতীবুল আম্বিয়া' বলা হয়। (ইবনে কাসীর, বাহরে মুহীত)

হযরত শোয়ায়েব (আ) যে সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন, কোরআন পাকে কোথাও তাদেরকে 'আহ্লে মাদইয়ান' ও 'আসহাবে মাদইয়ান' নামে উল্লেখ করা হয়েছে আবার কোথাও 'আসহাবে আইকা' নামে। 'আইকা' শব্দের অর্থ জঙ্গল ও বন।

কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ 'আসহাবে মাদইয়ান' ও 'আসহাবে আইকা' পৃথক পৃথক জাতি। তাদের বাসস্থানও ছিল ভিন্ন ভিন্ন এলাকায়। হযরত শোয়ায়েব (আ) প্রথমে এই জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। তারা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর অপর জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। উভয় জাতির উপর যে আযাব আসে, তার ভাষাও বিভিন্ন রূপ। 'আসহাবে মাদইয়ানের' উপর কোথাও صَيْحَةٌ এবং কোথাও رَجْفَةٌ এবং 'আসহাবে

আইকার' উপর কোথাও ظلة এর আযাব উল্লেখ করা হয়েছে। صيحة শব্দের অর্থ বিকট চিৎকার এবং ভীষণ শব্দ। رجفة শব্দের অর্থ ভূমিকম্প এবং ظلة শব্দের অর্থ ছায়াযুক্ত ছাদ, শামিয়ানা। আসহাবে আইকার উপর এভাবে নাযিল করা হয় যে, প্রথমে কয়েকদিন তাদের এলাকায় ভীষণ গরম পড়ে। ফলে গোটা জাতি ছটফট করতে থাকে। অতঃপর নিকটস্থ একটি গভীর জঙ্গলের উপর গাঢ় মেঘমালা দেখা দেয়। ফলে জঙ্গলে ছায়া পড়ে এবং শীতল বাতাস বইতে থাকে। এ দৃশ্য দেখে বস্তির সবাই জঙ্গলে জমায়েত হয়। এভাবে আল্লাহ্‌র অপরাধীরা কোনরূপ গ্রেফতারী পরোয়ানা ও সিপাই-সান্ত্রীর প্রহরা ছাড়াই নিজ পায়ে হেঁটে বধ্যভূমিতে গিয়ে পৌঁছে। যখন সবাই সেখানে একত্রিত হয়, তখন মেঘমালা থেকে অগ্নিবৃষ্টি বর্ষিত হয় এবং নিচের দিকে শুরু হয় ভূমিকম্প। ফলে সবাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

কোন কোন তফসীরবিদ বলেনঃ 'আসহাবে মাদইয়ান' ও 'আসহাবে আইকা' একই সম্প্রদায়ের দুই নাম। পূর্বোল্লিখিত তিন প্রকার আযাবই তাদের উপর নাযিল হয়েছিল। প্রথমে মেঘমালা থেকে অগ্নি বর্ষিত হয়, অতঃপর বিকট চিৎকার শোনা যায় এবং সবশেষে ভূমিকম্প হয়। ইবনে কাসীর এ অভিমতেরই প্রবক্তা।

মোট কথা, উভয় সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন হোক কিংবা একই সম্প্রদায়ের দু'নাম হোক, হযরত শোয়ায়েব (আ) তাদেরকে যে পয়গাম দেন, তা প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে। এ ব্যাখ্যার পূর্বে জেনে নিন যে, ইসলামই সব পয়গম্বরের অভিন্ন দাওয়াত। এর সারমর্ম হচ্ছে হক আদায় করা। হক দু'প্রকারঃ এক. সরাসরি আল্লাহ্‌র হক, যা করা না করার সাথে অন্য মানুষের কোন উল্লেখযোগ্য লাভ-ক্ষতি সম্পর্কযুক্ত নয়। যেমন, ইবাদত, নামায, রোযা ইত্যাদি। দুই. বান্দার হক। এর সম্পর্ক অন্য মানুষের সাথে। শোয়ায়েব (আ)-এর সম্প্রদায় উভয় প্রকার হক সম্পর্কে অজ্ঞ হয়ে উভয়ের বিপক্ষে কাজ করছিল।

তারা আল্লাহ্ তা'আলা ও রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে আল্লাহ্‌র হকের বিরুদ্ধাচরণ করছিল। এর সাথে ক্রয়-বিক্রয়ের মাপ ও ওজনে কম দিয়ে বান্দাদের হক নষ্ট করছিল। তদুপরি তারা রাস্তা ও সড়কের মুখে বসে থাকত এবং পথিকদের ভয়ভীতি দেখিয়ে তাদের ধন-সম্পদ লুটে নিত এবং শোয়ায়েব (আ)-এর শিক্ষার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে বাধা দিত। তারা এভাবে ভূ-পৃষ্ঠে অনর্থ সৃষ্টি করছিল। এসব অপরাধের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের হিদায়তের জন্য শোয়ায়েব (আ) প্রেরিত হয়েছিলেন।

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম দু'আয়াতে তাদের সংশোধনের জন্য শোয়ায়েব (আ) তিনটি বিষয় বর্ণনা করেছেন। প্রথমত يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ

অর্থাৎ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত উপাস্য হওয়ার যোগ্য কেউ নেই। একত্ববাদের এ দাওয়াতই সব পয়গম্বর দিয়ে এসেছেন। এটিই সব বিশ্বাস ও কর্মের প্রাণ। এ সম্প্রদায়ও সৃষ্ট বস্তুর পূজায় লিপ্ত ছিল এবং আল্লাহ্‌র সত্তা, গুণাবলী ও হক সম্পর্কে গাফিল হয়ে পড়েছিল। তাই তাদেরকে সর্বপ্রথম এ পয়গাম দেওয়া

হয়েছে। আরও বলা হয়েছে ঃ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ—অর্থাৎ তোমাদের কাছে প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসে গেছে। এখানে 'সুস্পষ্ট প্রমাণ'-এর অর্থ ঐসব মো'জেযা, যা শোয়ায়েব (আ)-এর হাতে প্রকাশ পেয়েছিল। তাঁর মো'জেযার বিভিন্ন প্রকার তফসীর বাহ্‌রে মুহীতে উল্লিখিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ

এতে كيل শব্দের অর্থ মাপ এবং ميزان শব্দের অর্থ ওজন করা। بخس শব্দের অর্থ কারও পাওনা হ্রাস করে ক্ষতি করা। অর্থাৎ তোমরা মাপ ও ওজন পূর্ণ কর এবং মানুষের দ্রব্যাদিতে কম দিয়ে তাদের ক্ষতি করো না।

এতে প্রথমে একটি বিশেষ অপরাধ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যা ক্রয়-বিক্রয়ের সময় ওজনে কম দিয়ে করা হত। অতঃপর وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ বলে সর্বপ্রকার হকে ত্রুটি করাকে ব্যাপকভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তা ধন-সম্পদ, ইযযত-আবরু অথবা অন্য যে কোন বস্তুর সাথেই সম্পর্কযুক্ত হোক না কেন।---(বাহরে মুহীত)

এ থেকে জানা গেল যে, মাপ ও ওজনে পাওনার চাইতে কম দেওয়া যেমন হারাম, তেমনি অন্যান্য হকে ত্রুটি করাও হারাম। কারও ইযযত-আবরু নষ্ট করা, কারও পদমর্যাদা অনুযায়ী তার সম্মান না করা, যাদের আনুগত্য জরুরী তাদের আনুগত্যে ত্রুটি করা অথবা যার সম্মান করা ওয়াজিব, তার সম্মানে ত্রুটি করা ইত্যাদি সবই এ অপরাধের অন্তর্ভুক্ত, যা শোয়ায়েব (আ)-এর সম্প্রদায় করত। বিদায় হজ্জের ভাষণে রসূলুল্লাহ্ (সা) মানুষের ইযযত-আবরুকে তাদের রক্তের সমান সম্মানযোগ্য ও সংরক্ষণযোগ্য সাব্যস্ত করেছেন।

কোরআন পাকে تطفيف ও مطففين—এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। উপরোক্ত সব বিষয়েই এর অন্তর্ভুক্ত। হযরত ওমর (রা) এক ব্যক্তিকে তড়িঘড়ি রুকূ-সিজদা করতে দেখে বললেন ঃ قَدْ طَفَّفْتَ অর্থাৎ তুমি মাপ ও ওজনে ত্রুটি করেছ। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক) অর্থাৎ তুমি নামাযের হক পূর্ণ করনি। এখানে নামাযের হক পূর্ণ করাকে تطفيف শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا—অর্থাৎ পৃথিবীর সংস্কার সাধিত হওয়ার পর তাতে অনর্থ ছড়িও না। এ বাক্যটি সূরা আ'রাফে পূর্বেও উল্লিখিত হয়েছে। সেখানে এর বিস্তারিত অর্থ এই বর্ণিত হয়েছে যে, পৃথিবীর বাহ্যিক সংস্কার হল, প্রত্যেকটি বস্তুকে যথার্থ স্থানে ব্যয় করা এবং নির্ধারিত সীমার প্রতি লক্ষ্য

রাখা। বস্তুত তা ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার উপর নির্ভরশীল। আর অভ্যন্তরীণ সংস্কার হল, আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক রাখা এবং তা তাঁর নির্দেশাবলী পালনের উপর ভিত্তিশীল। এমনি-ভাবে পৃথিবীর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অনর্থ এসব নীতি ত্যাগ করার কারণেই দেখা দেয়। শোয়ায়েব (আ)-এর সম্প্রদায় এসব নীতির প্রতি চরম উপেক্ষা প্রদর্শন করেছিল। ফলে পৃথিবীর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সব রকম অনর্থ বিরাজমান ছিল, তাই তাদেরকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তোমাদের এসব কর্মকাণ্ড সমগ্র ভূপৃষ্ঠে অনর্থ সৃষ্টি করবে। তাই এগুলো থেকে বেঁচে থাক।

অতঃপর বলা হয়েছে ঃ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ০ —অর্থাৎ যদি তোমরা অবৈধ কাজকর্ম থেকে বিরত হও, তবে এতেই তোমাদের ইহকাল ও পর-কালের কল্যাণ ও মঙ্গল নিহিত রয়েছে। ধর্ম ও পরকালীন মঙ্গলের বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। কারণ, এটি আল্লাহ্‌র আনুগত্যের সাথেই সর্বতোভাবে জড়িত। ইহকালের মঙ্গল এ জন্য যে, যখন সবাই জানতে পারবে যে, অমুক ব্যক্তি মাপ ও ওজনে এবং অন্যান্য হকের ব্যাপারে সত্যনিষ্ঠ, তখন বাজারে তার প্রভাব বিস্তৃত হবে এবং ব্যবসায়ে উন্নতি সাধিত হবে।

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, তোমরা মানুষকে ভীতি প্রদর্শন ও আল্লাহ্‌র পথে বাধা দান করার জন্য পথে-ঘাটে ওঁৎ পেতে বসে থেকো না। কোন কোন তফসীরবিদের মতে এখানে উভয় বাক্যের উদ্দেশ্যই এক অর্থাৎ তারা রাস্তাঘাটে বসে শোয়ায়েব (আ)-এর কাছে আগমনকারীদের ভীতি প্রদর্শন করত। তাদেরকে এ কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

আবার কেউ কেউ বলেন যে, তাদের পৃথক পৃথক দু'টি অপরাধ ছিল। পথে বসে লুটপাটও করত এবং শোয়ায়েব (আ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতেও বাধা দিত। প্রথম বাক্যে প্রথম অপরাধ এবং দ্বিতীয় বাক্যে দ্বিতীয় অপরাধ বর্ণনা করা হয়েছে। 'বাহ্‌রে মুহীত' প্রভৃতি তফসীর গ্রন্থে এই অর্থই গৃহীত হয়েছে। তারা শরীয়ত বিরোধী অবৈধ কর আদায় করার জন্য রাস্তার মোড়ে স্থাপিত চৌকিসমূহকেও পথে বসে লুটপাট করার অন্তর্ভুক্ত করেছে।

আল্লামা কুরতুবী বলেন ঃ যারা পথে বসে শরীয়ত বিরোধী অবৈধ কর আদায় করে, তারাও শোয়ায়েব (আ)-এর সম্প্রদায়ের ন্যায় অপরাধী, বরং তাদের চাইতেও অধিক অত্যা-চারী ও দুষ্কৃতকারী।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا —অর্থাৎ তোমরা আল্লা-হ্‌র পথে বক্রতার অন্বেষণে ব্যাপৃত থাক, যাতে কোথাও অঙ্গুলি রাখার জায়গা পাওয়া গেলে আপত্তি ও সন্দেহের ঝড় সৃষ্টি করে মানুষকে সত্য ধর্ম থেকে বিমুখ করার চেষ্টা করা যায়।

এরপর বলা হয়েছে ঃ

وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ

এখানে তাদেরকে হুঁশিয়ার করার জন্য উৎসাহ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শন উভয় পন্থা ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমে উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামত স্মরণ করানো হয়েছে যে, তোমরা পূর্বে সংখ্যা ও গণনার দিক দিয়ে কম ছিলে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের বংশ বৃদ্ধি করে তোমাদেরকে একটি বিরাট জাতিতে পরিণত করেছেন। অথবা তোমরা ধনসম্পদের দিক দিয়ে কম ছিলে, আল্লাহ্ তা'আলা ঐশ্বর্য দান করে তোমাদের স্বনির্ভর করে দিয়েছেন। অতঃপর ভীতি প্রদর্শনার্থ বলা হয়েছে ঃ পূর্ববর্তী অনর্থ সৃষ্টিকারী জাতিসমূহের পরিণামের প্রতি লক্ষ্য কর---কওমে নূহ্, 'আদ, সামূদ ও কওমে লূতের উপর কি ভীষণ আযাব এসেছে। তোমরা ভেবেচিন্তে কাজ করো।

পঞ্চম আয়াতে এ সম্প্রদায়ের একটি সন্দেহের জওয়াব দেওয়া হয়েছে। শোয়ায়েব (আ)-এর দাওয়াতের পর তাঁর সম্প্রদায় দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। কিছুসংখ্যক মুসলমান হয় এবং কিছুসংখ্যক কাফিরই থেকে যায়। কিন্তু বাহ্যিক দিক দিয়ে উভয় দল একই রূপ আরাম-আয়েশে দিনাতিপাত করতে থাকে। এতে তারা সন্দেহ প্রকাশ করে যে, কাফির হওয়া অপরাধ হলে অপরাধীরা অবশ্যই শাস্তি পেত। এ সন্দেহের উত্তরে বলা হয়েছে ঃ فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا অর্থাৎ তাড়াহুড়া কিসের? আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় সহনশীলতা ও কৃপাগুণে অপরাধীদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। তারা যখন চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে যায়, তখন সত্য ও মিথ্যার মীমাংসা করে দেওয়া হয়। তোমাদের অবস্থাও তদ্রূপ। তোমরা যদি কুফর থেকে বিরত না হও, তবে অতি সত্বর কাফিরদের উপর চূড়ান্ত আযাব নাযিল হয়ে যাবে।

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ
آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ۚ قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا
كَارِهِينَ ﴿٨٨﴾ قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ
بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا ۚ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ
يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا ۚ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۚ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا ۚ
رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ﴿٨٩﴾
وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا

لَخٰسِرُوْنَ ﴿٩٠﴾ فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ﴿٩١﴾
الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ۚ اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا
كَانُوْا هُمُ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٩٢﴾ فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ
رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ ۚ فَكَيْفَ اٰسٰى عَلٰى قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ﴿٩٣﴾

(৮৮) তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক সর্দাররা বলল ঃ হে শোয়ায়েব! আমরা অবশ্যই তোমাকে এবং তোমার সাথে বিশ্বাস স্থাপনকারীদেরকে শহর থেকে বের করে দেব অথবা তোমরা আমাদের ধর্মে প্রত্যাবর্তন করবে। শোয়ায়েব বলল ঃ আমরা অপছন্দ করলেও কি? (৮৯) আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা অপবাদকারী হয়ে যাব যদি আমরা তোমাদের ধর্মে প্রত্যাবর্তন করি, অথচ তিনি আমাদের এ থেকে মুক্তি দিয়েছেন। আমাদের কাজ নয় এ ধর্মে প্রত্যাবর্তন করা, কিন্তু আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ যদি চান। আমাদের প্রতিপালক প্রত্যেক বস্তুকে স্বীয় জ্ঞান দ্বারা বেষ্টন করে আছেন! আল্লাহ্‌র প্রতিই আমরা ভরসা করেছি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ফয়সালা করে দিন---যথার্থ ফয়সালা। আপনিই শ্রেষ্ঠতম ফয়সালাকারী। (৯০) তার সম্প্রদায়ের কাফির সর্দাররা বলল ঃ যদি তোমরা শোয়ায়েবের অনুসরণ কর, তবে নিশ্চিতই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (৯১) অনন্তর পাকড়াও করল তাদেরকে ভূমিকম্প। ফলে তারা সকাল বেলায় গৃহমধ্যে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। (৯২) শোয়ায়েবের প্রতি মিথ্যারোপকারীরা যেন কোনদিন সেখানে বসবাসই করেনি। যারা শোয়ায়েবের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হল। (৯৩) অনন্তর সে তাদের কাছ থেকে প্রস্থান করল এবং বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের পালনকর্তার পয়গাম পৌঁছে দিয়েছি এবং তোমাদের হিত কামনা করেছি। এখন আমি কাফিরদের জন্য কেন দুঃখ করব?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তার সম্প্রদায়ের অহংকারী সর্দাররা (একথা শুনে ধৃষ্টতা সহকারে) বলল ঃ হে শোয়ায়েব! (মনে রেখো,) আমরা তোমাকে এবং তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদের বস্তি থেকে বের করে দেব অথবা তোমরা আমাদের ধর্মে প্রত্যাবর্তন করবে। [তাহলে আমরা কিছুই বলব না। একথা মু'মিনদের বলার কারণ এই যে, তারাও ইতিপূর্বে কুফরী মতেই ছিল। কিন্তু শোয়ায়েব (আ) পয়গম্বর বিধায় কখনও কুফরী মতে ছিলেন না। তাঁকে বলার কারণ এই যে, নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে তিনি যে নিরপেক্ষ ছিলেন, এ থেকেই তারা বুঝে নিয়েছিল যে, তাঁর ধর্মমতও তাদের মতই হবে]। শোয়ায়েব (আ) উত্তর দিলেন ঃ আমরা কি তোমাদের ধর্মে ফিরে আসব যদিও আমরা (সপ্রমাণে ও সজ্ঞানে) একে অপছন্দনীয় (ও

ঘৃণার্হ) মনে করি ? (অর্থাৎ এ ধর্ম বাতিল হওয়ার প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও আমরা কিরূপে তা গ্রহণ করতে পারি) ? আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপকারী হয়ে যাব যদি (আল্লাহ্ না করুন) আমরা তোমাদের ধর্মে প্রত্যাবর্তন করি। [কেননা প্রথমত কুফরকে সত্যধর্ম মনে করাই আল্লাহ্‌র প্রতি অপবাদ আরোপ করা। বিশেষত কোন মু'মিনের কাফির হওয়া আরও বেশী অপবাদ। কেননা, তা সত্য প্রমাণকে কবুল করা ও জ্ঞান লাভের পরে হয়। এ তো গেল প্রথমোক্ত অপবাদ। দ্বিতীয় অপবাদ এই যে, এতে প্রতীয়মান হয় আল্লাহ্ তাকে যে প্রমাণ ও জ্ঞান দিয়েছিলেন, যাকে সে অবশ্য সত্য মনে করত, তা ভ্রান্ত ছিল। শোয়ায়েব (আ) 'প্রত্যাবর্তন' শব্দটি সঙ্গীয় মু'মিনদের হিসাবে বলেছেন কিংবা সর্দারদের ধারণার প্রেক্ষিতে অথবা কথার পৃষ্ঠে কথা হিসাবে]। তোমাদের ধর্মে প্রত্যাবর্তন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় ; কিন্তু যদি আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্ চান (সে চাওয়ার উপযোগিতা তিনিই জানেন)। আমাদের পালনকর্তার জ্ঞান সব বস্তুকে বেষ্টনকারী। (এ জ্ঞান দ্বারা তিনি সব বিধিলিপির উপযোগিতা জানেন ; কিন্তু) আমরা আল্লাহ্‌র প্রতিই ভরসা রাখি [ভরসা রেখে আশা করি যে, তিনি আমাদের সত্যধর্মেই প্রতিষ্ঠিত রাখবেন। এতে সন্দেহ করা উচিত নয় যে, 'খাতেমা-বিলখায়র' অর্থাৎ স্বীয় শুভ পরিণাম সম্পর্কে শোয়ায়েব (আ) নিশ্চিত ছিলেন না। অথচ পয়গম্বরদের এ নিশ্চয়তা দেওয়া হয়। উত্তর এই যে, এখানে উদ্দেশ্য হল স্বীয় অক্ষমতা প্রকাশ করা এবং সবকিছু আল্লাহ্‌র হাতে সমর্পণ করা। এটা নবুয়তের পূর্ণত্বের অপরিহার্য অঙ্গ। এ বক্তব্যকে মু'মিনদের দিক দিয়ে দেখা হলে কোন প্রশ্নই দেখা দেয় না। শোয়ায়েব (আ) এ উত্তর দিয়ে যখন দেখলেন যে, তাদের সম্বোধন করা মোটেই কার্যকর হচ্ছে না এবং তাদের ঈমানেরও কোন আশা নেই, তখন তাদেরকে ত্যাগ করে আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করলেন ঃ] হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ফয়সালা করে দিন (যা সর্বদা) সত্যভাবে (হয়ে থাকে। কেননা, আল্লাহ্‌র ফয়সালা সত্য হওয়া জরুরী। অর্থাৎ এখন কার্যক্ষেত্রে সত্যের সত্য এবং মিথ্যার মিথ্যা হওয়া সুস্পষ্ট করে দিন।) এবং আপনি শ্রেষ্ঠতম ফয়সালাকারী। পক্ষান্তরে তাঁর সম্প্রদায়ের (উপরোক্ত) কাফির সর্দাররা [শোয়ায়েব (আ)-এর এ অলংকারপূর্ণ বক্তব্য শুনে শংকিত হল যে, শ্রোতারা না আবার এতে প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ে। তাই তারা অবশিষ্ট কাফিরদের] বলল ঃ যদি তোমরা শোয়ায়েব (আ)-এর অনুসরণ কর, তবে নিশ্চিত ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (ধর্মেরও ক্ষতি হবে এবং পার্থিব ক্ষতিও হবে। কারণ, আমাদের ধর্ম সত্য আর সত্য ধর্ম ত্যাগ করা ধর্মীয় ক্ষতি আর মাপ ও ওজন পূর্ণ করলে মুনাফা কম হবে। এটি পার্থিব ক্ষতি। মোট কথা, তারা কুফর থেকে এক ইঞ্চিও হটল না। এখন আযাব আসাটা সময়ের ব্যাপার ছিল মাত্র)। অতঃপর ভূমিকম্প তাদের পাকড়াও করল এবং তারা গৃহমধ্যে উপুড় হয়ে রইল। যারা শোয়ায়েব (আ)-কে মিথ্যা বলেছিল (এবং মুসলমানদের গৃহহারা করতে উদ্যত ছিল, স্বয়ং) তাদের অবস্থা এরূপ হয়ে গেল, যেন তারা এসব গৃহে কোনদিন বাসই করেনি। যারা শোয়ায়েব (আ)-কে মিথ্যা বলেছিল (এবং তাঁর অনুসারীদের ক্ষতিগ্রস্ত বলত, স্বয়ং) তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেল। অতঃপর শোয়ায়েব (আ) তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে চললেন (এবং পরিতাপ প্রকাশার্থ স্বাগত সম্বোধন করে বললেন ঃ) হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের আমার পালনকর্তার বার্তা পৌঁছিয়েছিলাম (যা পালন করা

সর্বপ্রকার সাফল্যের কারণ ছিল) এবং আমি তোমাদের হিত কামনা করেছি, (আপ্রাণ চেষ্টা করে বুঝিয়েছি, কিন্তু পরিতাপের বিষয়, তোমরা তা শোননি। ফলে এ অশুভ দিন দেখেছ। অতঃপর তাদের কুফরী ও শত্রুতা স্মরণ করে বললেন ঃ যখন তারা নিজেরাই এ বিপদ টেনে নিয়েছে, তখন) আমি কাফিরদের (ধ্বংস হওয়ার) জন্য কেন দুঃখ করব?

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শোয়ায়েব (আ)-কে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা বলল ঃ আপনি যদি সত্যপন্থী হতেন, তবে আপনার অনুসারীরা সমৃদ্ধ হত এবং অমান্যকারীদের উপর আযাব আসত। কিন্তু হচ্ছে এই যে, উভয় দল সমভাবে আরামে দিন যাপন করছে। এমতাবস্থায় আমরা আপনাকে সত্যপন্থী বলে কিরূপে মেনে নিতে পারি? উত্তরে শোয়ায়েব (আ) বললেন ঃ তাড়াহুড়া কিসের? অতিসত্বর আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন। এরপর সম্প্রদায়ের অহংকারী সর্দাররা অত্যাচারী ও উদ্ধত লোকদের চিরাচরিত পন্থায় বলে উঠল ঃ হে শোয়ায়েব! হয় তুমি এবং তোমার অনুসারী মু'মিনরা আমাদের ধর্মে ফিরে আসবে, না হয় আমরা তোমাদেরকে বস্তি থেকে উচ্ছেদ করে দেব।

তাদের ধর্মে ফিরে আসা কথাটা মু'মিনদের ক্ষেত্রে যথার্থই প্রযোজ্য। কারণ, তারা পূর্বে তাদের ধর্মেই ছিল এবং পরে শোয়ায়েব (আ)-এর দাওয়াতে সাড়া দিয়ে মুসলমান হয়েছিল। কিন্তু শোয়ায়েব (আ) একদিনও তাদের মিথ্যা ধর্মে ছিলেন না। আল্লাহ্র কোন পয়গম্বর কখনও কোন মুশরিকসুলভ মিথ্যা ধর্মের অনুসারী হতেই পারেন না। এমতাবস্থায় তাঁকে ফিরে আসার কথা বলা সম্ভবত এ কারণে ছিল যে, নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে হযরত শোয়ায়েব (আ) তাদের বাতিল কথাবার্তা ও কাজকর্ম দেখে চুপ থাকতেন এবং তাদের সাথে মিলেমিশে থাকতেন। ফলে তাঁর সম্পর্কে সম্প্রদায়ের লোকদের ধারণা ছিল যে, তিনিও তাদেরই সমধর্মী। ঈমানের দাওয়াত দেওয়ার পর তারা জানতে পারল যে, তাঁর ধর্ম তাদের থেকে ভিন্ন অথবা তিনি তাদের ধর্ম ত্যাগ করেছেন। শোয়ায়েব (আ) উত্তরে বললেন ঃ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ অর্থাৎ তোমাদের উদ্দেশ্য কি এই যে, তোমাদের ধর্মকে অপছন্দ করা সত্ত্বেও আমরা তোমাদের ধর্মে ফিরে যাব? অর্থাৎ এটা হতে পারে না। এ পর্যন্ত প্রথম আয়াতের বিষয়বস্তু বর্ণিত হল।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, শোয়ায়েব (আ) জাতিকে বললেন ঃ তোমাদের মিথ্যা ধর্ম থেকে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন। এরপর আমরা যদি তোমাদের ধর্মে ফিরে যাই, তবে এ হবে আমাদের পক্ষ থেকে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি জঘন্য অপবাদ আরোপ করা।

কেননা, প্রথমত কুফর ও শিরককে ধর্ম বলে স্বীকার করার অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলাই যেন এ নির্দেশ দিয়েছেন। এটা আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা অপবাদ। এছাড়া বিশ্বাস স্থাপন করা এবং জ্ঞান ও চক্ষুষ্মানতা অর্জিত হওয়ার পর পুনরায় কুফরের দিকে ফিরে যাওয়া যেন একথা বলা যে, পূর্বের ধর্ম মিথ্যা ও ভ্রান্ত ছিল। এখন যে ধর্ম গ্রহণ করা হচ্ছে,

তা-ই সত্য ও বিশুদ্ধ। এটা দ্বিমুখী মিথ্যা ও অপবাদ। কারণ, এতে সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য বলা হয়।

হযরত শোয়ায়েব (আ)-এর এ উক্তিতে এক প্রকার দাবী ছিল যে, তোমাদের ধর্মে আমরা কখনও ফিরে যেতে পারি না। এরূপ দাবী করা বাহ্যত আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্যের পরিপন্থী এবং নৈকট্যশীল ও অধ্যাত্মবিদদের পক্ষে অসমীচীন, তাই পরে বলেছেন ঃ

مَا كَانَ لَنَا أَنْ نَّعُوْدَ فِيْهَا إِلَّا أَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ رَبُّنَا ط وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ط عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا — অর্থাৎ আমরা তোমাদের ধর্মে কখনও ফিরে যেতে পারি না। অবশ্য যদি (আল্লাহ্ না করুন) আমাদের পালনকর্তাই আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছা করেন, তবে ভিন্ন কথা। আমাদের পালনকর্তার জ্ঞান প্রত্যেক বস্তুকে পরিবেষ্টনকারী। আমরা তাঁর উপরই ভরসা করেছি।

এতে স্বীয় অক্ষমতা প্রকাশ করা হয়েছে এবং আল্লাহ্‌র উপর ভরসা ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ আমরা কোন কাজ করা অথবা না করার কে? কোন সৎ কাজ করা অথবা মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকা আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতেই হয়ে থাকে। যেমন রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

لولا الله ما اهتدينا و لاتصدقنا و لا صلينا

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কৃপা না হলে আমরা সৎপথ পেতাম না, সদকা-খয়রাত করতে পারতাম না এবং নামায পড়তেও সক্ষম হতাম না।

জাতির অহংকারী সর্দারদের সাথে এ পর্যন্ত আলাপ-আলোচনার পর যখন শোয়ায়েব (আ) বুঝতে পারলেন যে, তারা কোন কিছুতেই প্রভাবান্বিত হচ্ছে না, তখন তাদের সাথে কথাবার্তা ছেড়ে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দোয়া করলেন ঃ

رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِيْنَ অর্থাৎ "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ও আমাদের জাতির মধ্যে ফয়সালা করে দিন, সত্যভাবে এবং আপনি শ্রেষ্ঠতম ফয়সালাকারী।" হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ فتح শব্দের অর্থ এখানে ফয়সালা করা। এ অর্থেই فاتح শব্দটি قاضى অর্থাৎ বিচারক অর্থে ব্যবহৃত হয়।---(বাহ্‌রে মুহীত)

প্রকৃতপক্ষে এর মাধ্যমে শোয়ায়েব (আ) স্বীয় সম্প্রদায়ের কাফিরদের ধ্বংস করার দোয়া করেছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা এ দোয়া কবুল করে ভূমিকম্পের মাধ্যমে তাদেরকে ধ্বংস করে দেন।

তৃতীয় আয়াতে অহংকারী সর্দারদের একটি ভ্রান্ত উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, তারা পরস্পরে অথবা নিজ নিজ অনুসারীদেরকে বলতে লাগল ঃ যদি তোমরা শোয়ায়েবের অনুসরণ কর, তবে অত্যন্ত বেওকুফ ও মূর্খ প্রতিপন্ন হবে।---(বাহ্‌রে মুহীত)

চতুর্থ আয়াতে তাদের উপর আপতিত আযাবের ঘটনা বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ অর্থাৎ তাদেরকে ভীষণ ভূমিকম্প পাকড়াও করল। ফলে তারা গৃহমধ্যে উপুড় হয়ে পড়ে রইল।

শোয়ায়েব (আ)-এর সম্প্রদায়ের আযাবকে এ আয়াতে ভূমিকম্প বলা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য আয়াতে اَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ বলা হয়েছে ; অর্থাৎ তাদেরকে ছায়া-দিবসের আযাব পাকড়াও করেছে। 'ছায়া-দিবসের' অর্থ এই যে, প্রথমে তাদের উপর ঘন কাল মেঘের ছায়া পতিত হয়। তারা এর নিচে একত্রিত হয়ে গেলে এ মেঘ থেকেই তাদের উপর প্রস্তর অথবা অগ্নিবৃষ্টি বর্ষণ করা হয়।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) উভয় আয়াতের সামঞ্জস্য প্রসঙ্গে বলেন ঃ শোয়ায়েব (আ)-এর সম্প্রদায়ের উপর প্রথমে এমন ভীষণ গরম চাপিয়ে দেওয়া হয়, যেন জাহান্নামের দরজা তাদের দিকে খুলে দেওয়া হয়েছিল। ফলে তাদের শ্বাস রুদ্ধ হতে থাকে। ছায়া এমন কি পানিতেও তাদের জন্য শান্তি ছিল না। তারা অসহ্য গরমে অতিষ্ঠ হয়ে ভূগর্ভস্থ কক্ষে প্রবেশ করে দেখল, সেখানে আরও বেশী গরম। অতঃপর অস্থির হয়ে জঙ্গলের দিকে ধাবিত হল। সেখানে আল্লাহ্ তা'আলা একটি ঘন কাল মেঘ পাঠিয়ে দিলেন, যার নিচে শীতল বাতাস বইছিল। তারা সবাই গরমে দিগ্বিদিক জ্ঞানহারা হয়ে মেঘের নিচে এসে ভিড় করল। তখন মেঘমালা আগুনে রূপান্তরিত হয়ে তাদের উপর বর্ষিত হল এবং ভূমিকম্পও এল। ফলে তারা সবাই ভস্মস্তূপে পরিণত হল। এভাবে তাদের উপর ভূমিকম্প ও ছায়ার আযাব দুই-ই আসে।---(বাহ্‌রে মুহীত)

কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ এটাও সম্ভব যে, তাদের বিভিন্ন অংশ ছায়ার আযাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। পঞ্চম আয়াতে তাদের ঘটনা থেকে অন্যান্যকে শিক্ষার সবক দেওয়া হয়েছে, যা এ ঘটনা বর্ণনা করার আসল উদ্দেশ্য। বলা হয়েছে ঃ اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا — غنى শব্দের এক অর্থ কোন স্থানে আরাম-আয়েশে জীবন-যাপন করা। এখানে এ অর্থই বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, তারা যেসব গৃহে আরাম-আয়েশে জীবন-যাপন করত, আযাবের পর এমন অবস্থা হল, যেন এখানে কোনদিন আরাম-আয়েশের নাম-নিশানাও ছিল না। অতঃপর বলা হয়েছে ঃ اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَانُوْا هُمُ الْخٰسِرِيْنَ অর্থাৎ যারা শোয়ায়েব (আ)-কে মিথ্যা বলেছিল,

তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হল। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যারা শোয়ায়েব (আ) ও তাঁর মু'মিন সঙ্গীদের বস্তি থেকে বহিষ্কার করার হুমকি দিত, পরিণামে ক্ষতির বোঝা তাদের ঘাড়েই চেপেছে।

ষষ্ঠ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ —অর্থাৎ স্বজাতির উপর আযাব আসতে দেখে শোয়ায়েব (আ) সঙ্গীদেরকে নিয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করেন। তফসীরবিদরা বলেন যে, তাঁরা মক্কা মুয়াযযমা চলে আসেন এবং শেষ পর্যন্ত এখানেই অবস্থান করেন।

জাতির চরম অবাধ্যতায় নিরাশ হয়ে শোয়ায়েব (আ) বদদোয়া করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু যখন আযাব এসে গেল, তখন পয়গম্বরসুলভ দয়ার কারণে তাঁর অন্তর ব্যথিত হল। তাই নিজের মনকে প্রবোধ দিয়ে জাতির উদ্দেশে বললেন ঃ আমি তোমাদের কাছে প্রতি-পালকের নির্দেশ পৌঁছে দিয়েছিলাম এবং তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষায় কোন ত্রুটি করিনি ; কিন্তু আমি কাফির সম্প্রদায়ের জন্য কতটুকু কি করতে পারি ?

ইফাবা—২০০৪-২০০৫—প্র/ ১৪৮৪(উ)—৫,২৫০